আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার পঞ্চচত্বারিংশ গ্রন্থ

অপরিচিতা

শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

কার্ত্তিক,—১৩২৬
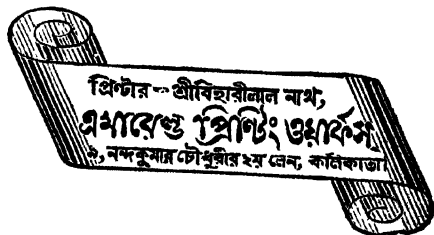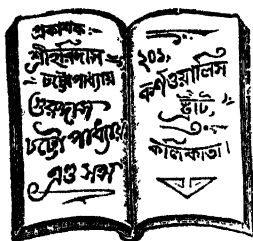
=প্রিয়জনকে উপহার দিবার=

কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ=

শৈব্যা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়	...	...	১৷৹
বিন্দুর ছেলে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		...	১৷৹
মিলন-মন্দির—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য		...	২৲
শর্ম্মিষ্ঠা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়	...	...	১৲
বাণী—৺রজনীকান্ত সেন	...	...	১৲
বিরাজ-বৌ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		...	১।৹
নমিতা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া		...	২৲
সফলস্বপ্ন—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়		...	১৷৹
সাবিত্রী-সত্যবান্—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়		...	১৷৹
সীতাদেবী—শ্রীজলধর সেন	...	...	১৲
দত্তা—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	...	২৷৹
পদ্মিনী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়	...	...	১৷৹
কল্যাণী—৺রজনীকান্ত সেন	...	...	১৲
বাগ্‌দত্তা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী		...	২৲
মেজ-বউ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী	...	...	১৲
কুললক্ষ্মী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়	...	...	১।৹

অপরিচিতা

১

সেদিন রবিবার। আফিস, আদালত সব বন্ধ। হাতে বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম ছিল না। দিনটা আর কাট্‌তেই চায় না। ঘুমিয়ে, নভেল পড়ে কোন রকমে দুপুরটা কাটান গেল। বিকেল-বেলায় একটু বেড়াতে যা'ব বলে, কাপড় পরে, মনি-ব্যাগটা পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়লুম। বসন্তকাল; দিব্য ফুর্‌ফুরে বাতাস দিচ্ছিল। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলায় একটা সজীবতা সাড়া দিয়ে উঠেছে। বেলা ৬টা বাজে। প্রকৃতিদেবী যেন ফুলের গহনা সর্ব্বাঙ্গে পরে', লাজনম্রা নববধূর মত সন্ধ্যার ঘোম্‌টা মুখে দিয়ে ধীরে-ধীরে প্রিয়ের উদ্দেশে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ট্রামে আরোহী খুব কমই ছিলেন। আমি একখানা বেঞ্চ অধিকার করে বসেছিলুম। গাড়ী জগুবাবুর বাজার, জলটুঙ্গি ছাড়িয়ে ক্রমশঃই অগ্রসর হচ্ছিল; কিন্তু, আমার সে দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। আমি তখন বসন্ত প্রকৃতির শোভাদর্শনে মুগ্ধ।

কিন্তু থিয়েটার রোডের মোড়ে হঠাৎ আমার ধ্যান-ভঙ্গ হয়ে গেল। চম্‌কে চেয়ে দেখি; একটি সজীব বসন্ত-মূর্ত্তি আমার সুমুখের আসনে এসে ব'স্‌লেন। সংস্কৃতে 'সঞ্চারিণী লতেব' পড়েছিলুম; কিন্তু চোখে দেখ্‌বার সুযোগ ও সুবিধা এ পর্য্যন্ত হয় নি; আজ কিন্তু কথাটার যথার্থতা উপলব্ধি ক'রলুম। তরুণীর বয়স তের-চৌদ্দ হ'বে, দিব্যি ছিপ্‌ছিপে গড়ন। নাক, মুখ, চোখ্ যেন তূলি দিয়ে আঁকা, বিশেষতঃ চোখ্ দু'টি। আর সবার উপর তার রঙটা। সেটা চাঁপা ফুলের মতনও নয়—তবে দুধে-আল্‌তার রঙ্ বল্লে অনেকটা এগিয়ে যায় বটে। আমি প্রথমটা হতভম্ব হয়ে হাঁ করে, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলুম, কিন্তু মেয়েটি আমার মুখের উপর চোখ্ দু'টি তুলে এমন করে রাখ্‌লে যে, আমি চোখ্ ফিরিয়ে নিতে পথ পেলুম না। বলেছি তো যে, সে চোখ্ দু'টিতে কি-একটা জ্যোতিঃ আছে, যা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। সে চোখে একটা নীরব ভৎ'সনা না থাক্‌লেও, একটা আত্ম-মর্য্যাদার ভাব যে ছিল, তা' আমি বুঝেছিলুম। মেয়েটিকে দেখে তার উপর একটা সম্ভ্রমের ভাব গোড়া থেকেই আমার মনে উঠেছিল। সেই সম্ভ্রমের যে তিনি সম্পূর্ণ অধিকারিণী সে বিষয়ে বোধ হয় কোন তর্কই উঠ্‌তে পারে না।

একটু পরে কণ্ডাক্টার টিকিট্ দিতে এলে, তরুণী হাতে-

ঝোলান ব্যাগ খুঁজ্‌তে আরম্ভ করে দিলেন। আমি ভাবলুম, বোধ হয় পয়সা কম পড়েছে, তাড়াতাড়ি একটা টাকা বা'র করে দিব ভাবছি, এমন সময় টং করে কি-একটা শব্দ হ'ল। চেয়ে দেখি, তরুণী জানালার ফাঁকের মধ্যে মুখ দিয়ে দেখ্‌ছেন, আর কণ্ডাক্টারটা হাঁ-করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কণ্ডাক্টারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে বল্লুম "সিকিটা কি জান্‌লার মধ্যে পড়ে গেছে?" "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলে তরুণী, একটু সরে দাঁড়ালেন। আমিও জানালার মধ্যে মুখ দিয়ে একবার দেখ্‌বার চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না। পরে ধীরে ধীরে বল্লুম, "যদি কিছু মনে না করেন—তা' হ'লে ভাড়াটা—আমি দিই, বোধ হয় আপনার পয়সা কম পড়েছে?" "না—না, আপনি কেন দেবেন?" বলিয়া তরুণী ব্যাগটি আবার খুলিলেন; কিন্তু খুলেই তাঁর মুখখানি যেন কেমন হয়ে গেল। একটি সিকি বা'র করে কণ্ডাক্টারকে দিয়ে বল্লেন, "তাই তো আমার হাপ্‌গিনিটা ওর মধ্যে পড়ে গেছে; ওটা বা'র করে দিতে পার না?"

"আজ্ঞে ও তো এখন বা'র করা যাবে না, ডিপোর গাড়ী গেলে তবে পেতে পারেন।"

"না—না, তা' হ'লে তো হবে না; আমি তো ততক্ষণ থাক্‌তে পারব না—একেই দেরী হয়ে গেছে।"

"আজ্ঞে অন্ততঃ ধর্ম্মতলায় গেলেও না হয় চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে; তার আগে তো কিছু করে উঠ্‌তে পারা যাবে না।"

"তা' হ'লে কি হবে? আমার যে ভারী দরকার।" তরুণী উৎকণ্ঠার সহিত কথা কয়টি বলে, এদিক-ওদিক চাইতে লাগ্‌লেন। সে দৃষ্টির অর্থ বোঝবার মত মনের অবস্থা বোধ হয় আমার সে সময় ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম "যদি কিছু মনে না করেন, তা' হ'লে এই রকম ক'রলে হয় না? ডিপোয় যেতে বা ধর্ম্মতলায় গিয়ে হাণ্ড্‌ব্যাগটা নিতে আমার কোনই অসুবিধে হবে না—তা' হ'লে আপনি যদি আমার এই সাড়ে সাত টাকা গ্রহণ করেন—তা' হ'লে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে ক'রব।"

"আপনি আমার জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার কর্ব্বেন?"

"না—কষ্ট আর কি—আপনার যদি উপকার হয়—আর আমি তো ঐ দিকেই যাচ্ছি তবে একটু দেরী হ'বে। তা' আমার বিশেষ তাড়াতাড়ি নেই। তা' হ'লে—" বলে আমি টাকা কয়টি তরুণীর হাতে দিলাম। লজ্জায় তাঁহার মুখখানি লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। পরে, একটু ইতস্ততঃ করে তিনি টাকাগুলি ব্যাগে ফেলে বল্লেন, "দেখুন দিকি, আমার নিজের অসাবধানতার জন্যে আপনাকে কত কষ্টভোগ ক'রতে হ'ল।

সিকিটা দেবার সময় যদি একটু দেখে দিই, আর তাও যদি কণ্ডাক্টারের হাতে দিই, তা' না—একেবারে জান্‌লার মধ্যে—এমন অন্যমনস্ক ছিলুম। আর টাকারও আমার বিশেষ দরকার। আপনার এই উপকার চিরকাল মনে থাক্‌বে।" তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তে গাড়ী পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে পৌঁছুল। তরুণী ধন্যবাদ দিয়ে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করে, তাড়াতাড়ি একখানি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে ব'স্‌লেন। আমার চোখের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

তরুণী চলে গেলে দেখ্‌লুম, আরোহিগণের সকলেরই দৃষ্টি আমার ওপর। বুঝ্‌লুম, এতক্ষণ দু'জনেরই ওপর ছিল, এখন সেটা আমার একলার ওপর পড়েছে। আবার আরোহিগণের মধ্যে দু'একজন এমনভাবে আমার প্রতি চাচ্ছিলেন যে, বোধ হচ্ছিল, যেন আমি না থাক্‌লে তাঁরাই এই সামান্য উপকার করার সুখটা পেতেন। আবার একজন মুখফুটে একটা কুৎসিত রসিকতাই করে ফেল্লেন। এই রকমে যতক্ষণ না গাড়ী ধর্ম্মতলায় পৌঁছুল, ততক্ষণ আমি সকলেরই দৃষ্টি ও হাসি-ঠাট্টার বিষয় হয়ে পড়েছিলুম। যাক্‌, তা'তে আমার দুঃখু ছিল না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, ভাগ্যিস্‌ সেই অপরিচিতার সুমুখে এই সব ব্যাপার ঘটে নি। তা' হ'লে তিনি কি মনে কর্ত্তেন।

গাড়ী ধর্ম্মতলায় পৌছুল। কণ্ডাক্টার আমাকে নিয়ে গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে সমস্ত ব্যাপারটি জানাইল। ধর্ম্মতলায় কর্ত্তৃপক্ষের যে সাহেবটি থাকেন, আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনাটি সংক্ষেপে বলে, আমার নামের একখানা কার্ড দিলুম। নামটা পড়ে, আর আমি যে ক'লকাতা বারের একজন ব্যারিষ্টার— তা' ব্রিফ্-শূন্যই হই না কেন—তা' দেখে বোধ হয় তিনি আমার ওপর একটু নেক্‌নজর কর্লেন। তৎক্ষণাৎ একজন মিস্ত্রী ছুটে গিয়ে দু'খানা কাঠ খুলে যখন একটা চক্‌চকে নতুন আধলা বা'র কর্লে, তখন কণ্ডাক্টার প্রভৃতির মুখে একটা হাসির গুঞ্জন শোনা গেল। সাহেবও তাঁর গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করে আমাকে মিষ্টি মিষ্টি দু' কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি ভারি লজ্জায় পড়লুম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পার্লুম না। তাই তো, অমন সরলতাপূর্ণ চাহনি, অমন সুন্দর চেহারা যার সে কখনও এমন নীচ কাজ কর্ত্তে পারে! নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা-কিছু আছে। সেইজন্যে আস্‌বার সময় সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে এলুম যে যদি সেই মহিলাটি কোন খোঁজ নিতে আসেন, তা' হ'লে যেন আমার কার্ডখানি তাঁকে দেওয়া হয়, আর ঘটনাটি বলা হয়। সাহেব একটু হেসে ঘাড় না'ড়লেন; ভাবটা—'তিনিও তোমার এসেছেন, আর আমিও বলেছি।'

আফিস থেকে যখন বেরিয়ে আস্‌ছি তখন শুন্‌লুম, আমাদের সেই কণ্ডাক্টারটা অপর কর্ম্মচারীদের বল্‌ছে "ভায়া দেখ, এই আবার আর একরকম জোচ্চুরি। বেচারাকে কেমন ঠকিয়ে গেছে; সাবাস মেয়ে যা' হোক্।" ইচ্ছা হচ্ছিল গিয়ে গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলি, "বাপু আমার টাকা গেছে, আমার গেছে—তোমার তা'তে কি?" কিন্তু ইচ্ছাটাকে দমন কর্ত্তে হ'ল, কারণ জীবনে এমন বেকুব কখনও বনিনি। রাত্রি প্রায় আটটার সময় বাড়ী ফিরে এলুম। ব্যাপারটা আর কাহারও কাছে ভাঙ্‌লুম না, শুন্‌লে সকলে ঠাট্টা কর্ব্বে বইতো নয়। সকালে উঠে ট্রাম-কোম্পানীর চিঠির আশায় বা সেই অপরিচিতার চিঠির আশায় রোজই উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতুম, তারপর চা-পান কর্ত্তে কর্ত্তে খবরের কাগজের পার্শোন্যাল (personal) অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের তালিকাটি দেখাও একটা কাজ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কপাল-দোষে রোজই বিফল হ'তে হ'ত।

২

এই রকমে দু'বছর প্রায় কেটে গেছে। সেই ট্রামের কথাটাও প্রায় ভোল্‌বার মধ্যেই। তবে কচিৎ কখন এক একবার মনে পড়ে বই কি? এই সময় এক শনিবার সকাল বেলায় মিসেস্ রায়ের একখানি চিঠি এল। আগামী রবিবারে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ। মিসেস্ রায়ের নিমন্ত্রণে একটু বিশেষত্ব আছে যা' প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়, সুতরাং পরদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর ওখানে যেতে হ'ল।

রাস্তায় যেতে-যেতে কি জানি কেন, দু'বছর আগেকার এমনি দিনের একটি কথা বারবার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সেদিন বোধ হয় চাঁদ এমনি ধারাই উঠেছিল, বোধ হয় ফুল এমনি ধারাই ফুটেছিল। মোটর গিয়ে মিঃ রায়ের গাড়ী-বারান্দার তলায় থাম্‌ল। তাড়াতাড়ি নেমে ড্রয়িংরূমে ঢুক্‌তেই মিঃ রায় অভ্যর্থনা করে বসালেন। দু'চারজন নবাগত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। ওদিকে পাশের ঘরে

তখন মেয়েদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। মিসেস্ রায় এসে আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুক্‌তেই অনেকের হাসি-ঠাট্টা থেমে গেল। এটা মেয়েদের স্বধর্ম্ম, এতে দোষ দেওয়া যেতে পারে না; বরং সুখ্যাতিই করা যেতে পারে। আমি ঢুকেই তাঁদের রসভঙ্গ করার দরুণ একদফা ক্ষমা চাইলুম; তারপর মিসেস্ রায় একটি ষোড়শীকে আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। ইনি তাঁর ভগিনী, এখানে অনেকদিন ছিলেন না, কাল সবে এসেছেন, আর এঁর জন্যেই আমাদের এই নিমন্ত্রণ। সকল কথা শেষ করে মিসেস্ রায় যখন আমার পরিচয় দিয়ে লীলাকে একটা গান কর্ব্বার জন্যে বল্লেন, তখন আমি যে কি বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেব, তার ভাষা খুঁজে পেলুম না। লীলার কুসুম-পেলব আঙ্গুলগুলি যখন পিয়ানোর উপর পড়্‌ছিল, যখন সে গান গাইতে-গাইতে মৃদু-মৃদু হাস্‌ছিল তখন আমার ঠিক্ মনে হচ্ছিল, এঁকে পূর্ব্বে যেন কোথায় দেখেছি; আজও এখানে আস্‌বার সময় এই মূর্ত্তির কথাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তবুও সাহস হচ্ছিল না যে জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি সেই? গান শেষ হ'ল। সকলেই একটু-আধটু গল্প কর্ত্তে লাগ্‌লেন; আমিও আমার সন্দেহ দূর কর্ব্বার এই সুযোগ ত্যাগ কর্লুম না। নানা অবান্তর কথার পর ট্রাম সম্বন্ধে নানা দোষগুণ,

কর্ম্মচারীদের ব্যবহার ইত্যাদি বল্‌তে লাগ্‌লুম; কিন্তু সে তখন বোধ হয় আমার গল্পে কাণই দেয়নি বরং তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম যেন কেমন-একটা বিরক্তিভাব। বোধ হয় সে ভাব্‌ছিল—কোথাকার লোক দেখত, বোধ হয় ট্রাম কোম্পানীর একটা বড় শেয়ার-হোল্‌ডার হবে। আর গল্প পেলে না। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। খানিক পরে একটা হাই তুলে সে বলে উঠ্‌ল "দেখুন, এই ট্রামগুলোর সঙ্গে আমার একটা স্মৃতি জড়িত আছে।"

"স্মৃতি! কি রকম?" ব্যাপারটা এইবার দিনের মতন ফর্সা হয়ে গেল। সন্দেহ দূর হ'ল।

"দু'বছর পূর্ব্বে একটি ভদ্রলোক কালীঘাট থেকে ধর্ম্ম-তলার ট্রামে আমার সুমুখের বেঞ্চে বসেছিলেন।"

"খুব ভাগ্যবান্ লোক বলুন।"

"হ্যাঁ, যা বলেছেন; তবে সেই সৌভাগ্য কিন্‌তে তাঁকে যথেষ্ট ব্যয় কর্ত্তে হয়েছিল।"

মিসেস্ রায় বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "লীলার ঐ ঠাকুরমাদের মতন 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমীদের' গল্প ছাড়া আর পুঁজি নেই। ও গল্প শুনে-শুনে বাপু, আমাদের কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে। থাম্ বাপু।"

"না—না, আমি শুনিনি, আপনি গল্পটা বলুন।"

পাশের ঘর থেকে লীলার ভাই শরৎ আমার কথা শুনে ঘরে ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে বল্লেন "মিঃ গুপ্ত সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটির জ্বালায় আমাদের দিনকতক টেঁকা দায় হয়ে উঠেছিল। প্রথম-প্রথম থিয়েটারে বায়োস্কোপে, অপরিচিত লোক দেখ্‌লেই তাঁর খোঁজ নেবার জন্যে লীলা তো আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তু'লত। ওর মনে হ'ত যে, সব লোকই যেন সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ।"

মিসেস্ রায় বল্লেন "হ্যাঁ—লীলার ঐ এক রকম—চিরকালই ওর ঐ রকম গেল। ও সকলকেই ওর 'তিনি' ভাবে—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওর 'তাঁকে' আর পাওয়া গেল না।" বেচারী লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ছিল। আমি তাকে এই বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর্ব্বার জন্যে বল্লুম "আচ্ছা, আমাকে কি সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ বলে মনে হয়?" প্রথমটা সে কোন উত্তর দিতে পারলে না, কারণ তাকে এক বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে গিয়ে আর এক বিপদে ফেল্লুম। পরে ধীরে ধীরে মুখটি নীচু করে, নখ দিয়ে কার্পেটের ওপর্ দাগ কাট্‌তে কাট্‌তে বল্লে "সেই তো হচ্ছে বিপদ্। আমি এত ব্যস্ত ছিলুম যে, ভাল করে তাঁর দিকে চাইবারই অবকাশ পাই নি,—তাঁর নামটিও জিজ্ঞাসা করা হয় নি—তবে একবার মুহূর্ত্তমাত্র যে চেয়েছিলুম, তা'তে বোধ হয় আপনার—"

আর সে ব'ল্‌তে পার্‌লে না। আমি বল্লুম "যদি আপনারা কিছু মনে না করেন, তা' হ'লে আমি ঐ-সম্বন্ধে একটা গল্প বল্‌ব। অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার পর।"

আমার কথা শেষ হ'লে একটা চাপা হাসির সুর যেন ঘরময় খেলে গেল। লীলা রেগে মুখ হেঁট্‌ করে গজ্‌ গজ্‌ কর্ত্তে কর্ত্তে ঘর থেকে গেল—তাকে ধরে রাখা গেল না। শরৎ আমার পিট্‌ চাপ্‌ড়ে বলে উঠ্‌ল "You young gay dog! তোমার এই কাজ! আর আমরা রাজ্যি-শুদ্ধু লোকের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

খাওয়া-দাওয়ার পর আমার গল্প শোন্‌বার আর শ্রোতা পাওয়া গেল না। লীলা যে কোথায় লুকিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া দায় হ'ল। আমি ঘরে একলা পাইচারি কর্ত্তে কর্ত্তে লীলার একখানা ছবির কাছে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে-ছিলুম; শুন্‌তে পেলুম,—কে একজন মিহিসুরে ব'ল্‌ছেন "মিঃ গুপ্তকে এখন খুব 'জলি' বলে বোধ হচ্ছে।" আর একজন হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিলেন "ওটা পরশমণির গুণে।" তারপর যা ঘটেছিল তা আর বোধ হয় বলতে হবে না। শুভদিনে শুভক্ষণে, চারি চক্ষের শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এর জন্যে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য কর্ত্তে হয়েছে; তবে সেগুলার শোধ মায় সুদ-শুদ্ধু লীলার কাছ

থেকে আদায় করে নিতুম। লীলার মান-অভিমান ভাঙবার অস্ত্রদ্ ছিল আমার এই গল্প। আমি আরম্ভ কর্ত্তুম "থিয়েটার রোডের মোড়ে সে এসে উঠ্‌ল, হাতে তার একটা ঝুলান ব্যাগ ছিল। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর সে যখন একটা নতুন চক্‌চকে আধ্‌লা কণ্ডাক্টারকে দিতে গিয়ে জানলার মধ্যে ফেলে দিলে—অবশ্য সে সেটাকে একটা হাপ্‌গিনি মনে করেছিল ইত্যাদি।" তখন লীলা মান ভঙ্গ করে তাড়া-তাড়ি দু'হাতে আমার মুখ চেপে ধ'রত, আর বল্‌ত, "পুরুষ কি বলে একটা 'অবলা, সরলা, ননীবালার' ওপর অমন নজর দিয়েছিলে বলত!" আমি তখন অন্যমনস্ক-ভাবে গান ধর্ত্তুম—

"তোমরা সবাই ভাল ;
যার কপালে যেম্নি জুটেছে সেই আমাদের ভাল।"

স্নেহময়ী

লণ্ডনের কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে পিতা ও পুত্র মুখোমুখী হইয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া আছে। উভয়েরই মুখে উদ্বিগ্নের রেখা। টেবিলের উপরকার ঘড়িটি টিক্ টিক্ করিয়া গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। ঘড়ির প্রত্যেক শব্দ তাহাদিগের নিকট এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রতিমুহূর্ত্তে তাহারা ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে— যেন কাহারও অপেক্ষায়। হঠাৎ বালক ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল "মা তা' হ'লে দু'চার মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন, না বাবা? এগারটা বেজে গেছে, সেখান থেকে আস্‌তে বড় জোর আধঘণ্টা, পৌণে বারটার মধ্যে নিশ্চয়ই এসে পৌঁছবেন।" পিতা একটু হাসিয়া বলিলেন "পথে বিপদ্-আপদ্ আছে, কিছু বলা যায় না বাবা, তবে কি জান—হ্যাঁ এইবার তো আসা উচিত।"

"না বাবা, সে সব আজ কিছুই হবে না, আর মা জানেন যে আমরা তাঁর জন্যে কি রকম উদ্বিগ্ন হয়ে আছি, তিনি

নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি আস্‌বেন। আঃ, আজ যদি আমি সেখানে থাক্‌তুম তা' হ'লে আর এই কষ্ট ভোগ কর্ত্তে হ'ত না, মার গানের প্রশংসা সেইখানেই শুন্‌তে পেতুম। হ্যাঁ বাবা, মার গলা খুব মিষ্টি নয়? বালক উত্তরের অপেক্ষায় উৎসুক-নেত্রে পিতার প্রতি চাহিল।

"হবে" কেবল এই কথাটি অতি কষ্টে বৃদ্ধের মুখ হইতে বাহির হইল। পুত্র পিতার নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত কথা দু'টি শুনিয়া পুনরায় বলিল "তা' হ'লে মা এই কাজটা পাবেন নিশ্চয়ই পাবেন—না বাবা?" বৃদ্ধ ব্যথিতনেত্রে পুত্রের 'ইটন্-সুট্'-পরিহিত সুন্দর বলিষ্ঠ দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "হ্যাঁ বাবা, তোর মা কাজটা পেতে পারেন, তবে কি জানিস্ প্রত্যেক লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি—তোর মার গান আমাদের যেমন মিষ্টি লাগে অপরের কাছে—।"

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু থামিলেন। পুত্রের কিন্তু পিতার কথায় মন মোটেই ছিল না, সে তখন রাস্তায় গাড়ীর শব্দ শুনিতেছিল। পরে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "এ নিশ্চয়ই মা এসেছেন" বলিয়াই বালক চেয়ার হইতে লাফাইয়া, এক এক লাফে তিন তিন ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধও গাড়ীর শব্দ শুনিতে শুনিতে তাঁহার ঠাণ্ডা শীর্ণ হাত দু'খানি

অগ্নিকুণ্ডের উপর ধরিয়া শীতলতা দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে গান করিতে লাগিলেন—যেন আপন স্বর পরীক্ষা করিতেছেন। দু'এক ছত্র গান করিবার পর তিনি কাতরভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হে ভগবান্ কতদিন এ রকম থাক্‌বে, কতদিন এ রকম অসহায় পরাধীন হয়ে থাক্‌ব। কতদিন—কতদিন।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ দন্তে দন্ত পেষণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। বৃদ্ধ "নিনা" বলিয়া ডাকিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে বালক একটি রমণীর সহিত আসিয়া দাঁড়াইল। রমণীর সুন্দর মুখে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি আসিয়া পড়িয়া মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। মুখে পাউডার ও পেণ্টের দাগগুলি তখনও রহিয়াছে, স্কন্ধে 'অপেরা ক্লোক্' ঝুলিতেছে, রমণীর মুখ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। পুত্রের স্কন্ধে হাত দিয়া রমণী স্বামীর প্রতি অগ্রসর হইল। নিকটে আসিলে বৃদ্ধ স্ত্রীর হাতখানি লইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "খবর ভাল নিনা ?"

"নিশ্চয়ই প্রিয়তম, আজকের মতন ভাল গান আমি অন্য কোন দিন গাই নি, এ কেবল তোমার ও ডিকির জন্যে, আর আজকে আমার মন সম্পূর্ণরূপে গানের দিকেই ছিল, বাস্তবিক এ রকম গান আমি অন্য কোন দিন গাই নি।

শ্রোতারাও এ রকমটা আশা করে নি, তাঁহারাও আমাকে খুব উৎসাহিত করছিলেন।"

"ম্যানেজার কি বল্লে?"

"ওঃ তিনি ভারি খুসি হয়েছেন।" কিন্তু বৃদ্ধ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিলেন, তাহার মুখ বিষণ্ণ—যেন সে কি ভাবিতেছে।

"তা' হ'লে তুমি পরের মাস থেকে নিযুক্ত হ'লে,—চুক্তি-পত্র লেখা হয়ে গেল তো?"

"না, চুক্তিপত্র এখনও সই করা হয় নি।"

"কেন? তা' হ'লে কি—"

বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলেন না, সংশয়-দোলায় তাঁহার মন দুলিতে লাগিল।

"ম্যানেজার কিছুই ঠিক্ কর্ত্তে পারেন নি। কাল রাত্রে ভেরোনি গাইবে, তার গান শুনে কা'কে নিযুক্ত কর্ব্বেন ঠিক্ হবে।"

"ভেরোনি!" বৃদ্ধ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

"হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন, তাকে তো সকলেই জানে। আর তুমিও জান প্রিয়তম, তবে অন্য নামে।"

নিনা পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা শুতে যাও, রাত হয়েছে, তোমার বাবার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

"আমি কি শুনতে পাই না মা ?"

মাতা পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন "না বাবা,—তুমি যে আমাদের পরামর্শদাতা তা জানি, কিন্তু আজকে এই ছোট্ট পরামর্শদাতাটির পরামর্শ না নিয়ে দেখ্‌ব।"

নিনা পুনরায় পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। বালক মাতার সেই প্রচ্ছন্ন-গম্ভীর মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিয়া উঠিল "তা' হ'লে কি খবর ভাল নয় মা ?"

"হ্যাঁ বাবা সম্পূর্ণ ভাল নয়—ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী—বাবা ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী।"

বালক মাথাটি একটু নাড়িয়া বলিতে লাগিল "মা, আমরা তো কারও অনিষ্ট করি নি, তবে কেন তারা আমাদের অনিষ্ট কর্ব্বে ?"

কথা সমাপ্ত করিয়া বালক ধীরভাবে পকেটে হাত দিয়া বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে শুইতে যাইল। নিনা যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ততক্ষণ অনিমেষ-নয়নে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন, পরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে উপস্থিত হইয়া দেখেন বৃদ্ধ মাথা হেঁট করিয়া কি ভাবিতেছেন। রমণী স্বামীর স্কন্ধে তাঁহার বাহু দু'টি রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন "প্রিয়তম ভেরোনির আর একটা নাম আছে তা বোধ হয় তুমি জান—বোধ হয় কেন, ভাল রকমই জান।"

"অন্য নাম" বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু মেলিলেন। চারি চক্ষু মিলিল, কিন্তু উভয়েরই মুখ চিন্তাক্লিষ্ট।

"হ্যাঁ প্রিয়তম, তোমার নামে তার নাম।"

"ওঃ তুমি ডিকির মার কথা বল্‌ছ। আমার পূর্ব্ব স্ত্রীর কথা।"

"হ্যাঁ প্রিয়তম, ডিকির মার কথাই বল্‌ছি।"

নিনা একটু জোরে এই কথা কয়টি বলিলে বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কথাটা শুনিবামাত্র তাঁহার মুখশ্রী অন্যরূপ ধারণ করিল—যেন সে মুখ নয়। বোধ হয় পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহাকে কষ্ট দিতেছিল। নিনাও দু-এক মিনিট কিছুই বলিতে পারিল না, পরে স্বামীর সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "প্রিয়তম! আমি তোমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করি নি, তুমি তোমার পূর্ব্ব স্ত্রীর কথা আমাকে যা' বলেছ আমি তাই যথেষ্ট মনে করেছিলুম, কিন্তু আজ সৌভাগ্যক্রমে কি দুর্ভাগ্যক্রমে বল্‌তে পারি না আমরা দু'জনে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছি; সেইজন্যে আমি জান্‌তে চাই—না—না আমি জান্‌বার জন্যে উৎসুক—প্রিয়তম তুমি কি আমায় তোমার পূর্ব্ব স্ত্রীর কথা বল্‌বে—যদি তোমার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক হয়ে কষ্ট না দেয়। রিচার্ড অন্যমনস্কভাবে পত্নীর হাতখানি চাপড়াইতে চাপড়াইতে ধীরে ধীরে বলিলেন "হ্যাঁ কষ্টদায়ক

হলেও তোমার জান্‌বার অধিকার আছে। শোন, যখন আমি ভায়লেটাকে বিবাহ করি—তখন তাকে ভায়লেটা বলেই সকলে জান্‌ত—তখন আমি কুড়ি বৎসরের একজন অবিবেচক, বুদ্ধিহীন যুবক আর ব্যবসা নিয়েই পাগল। তার গলা কি মিষ্টিই তখন ছিল। তার মতন গাইতে তখন ইউরোপে কেউ পার্‌ত না—তুমিও না নিনা। তারপর যে সব ঘটেছিল সে সব আর তোমার শুনে কাজ নেই—ওঃ কি ভুলই করেছিলুম। দু'বছর পরে—ডিকি জন্মাবার পর—আমি সব জানতে পারলুম—সে দেবী নয় দানবী। আমার আশা-তরু শুকিয়ে গেল, জান নিনা সেই দিন থেকে আমার জীবন নষ্ট হ'ল।" রিচার্ড একটু থামিলেন, বোধ হয় বড়ই কষ্ট হইতেছিল, পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

"এক বছর আমি দেখ্‌লুম, তাকে শোধরাবার অনেক চেষ্টা কর্‌লুম কিন্তু কিছুই হ'ল না। প্রথমতঃ সে হেসেই উড়িয়ে দিত—তার পর শুন্‌বে নিনা—আমাকে ঘৃণা কর্ত্তে লাগ্‌লে। তার প্রাণে একটুও দয়া ছিল না—কি নিষ্ঠুর! ক্রমে সে আমাকে পাগল করে তুল্‌লে। আমি তার কাছ থেকে দূরে থাক্‌বার চেষ্টা কর্লুম—আমি পৃথক্ হলুম কেন জান? ডিকির জন্যে—আমার প্রাণাধিক ডিকির জন্যে। কিন্তু ফলে কি হ'ল জান, আমার জীবন, ভবিষ্যৎ উন্নতি—

সব নষ্ট হ'ল। তার পর প্রিয়তমে তোমায় পেলুম, তুমি এই অভাগাকে ও মাতৃহারা শিশুটিকে কোলে তুলে নিলে—তাদের নতুন জীবন দিলে। কেন তুমি এ কাজ ক'রলে নিনা? কেন ক'রলে?" "তোমাদের দু'জনকে ভালবাসি বলে প্রিয়তম" বলিয়া নিনা তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

"আর তোমার পুরস্কার হ'ল কি? কয়েক বছরের শাস্তি তার পর এক স্বাস্থ্যহীন স্বামী, যে স্বামী নিজেরই কোন কাজে লাগে না—যা'কে একজন স্ত্রীলোকের ওপর নির্ভর কর্ত্তে হয়—তার স্ত্রীর ওপর—"

"ও রকম কথা ব'ল না।"

নিনা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "কেন তুমি ও রকম ব'লছ। আগামী বছরে তোমার গলার স্বর নিশ্চয়ই ভাল হবে—ডাক্তার বলেছে যে তুমি আগে যেমন সকলের প্রিয় ছিলে সেই রকম আবার হবে।"

হো হো করিয়া হাসিয়া রিচার্ড বলিল "আমার স্বর! হ্যাঁ ফের ফিরে পেতে পারি বটে, যদি আমি কোনখানে দিন কতকের জন্তেও যেতে পারি, যদি আমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পাই, একটু শান্তি পাই। সে একেবারেই অসম্ভব নিনা, আমি আমার স্ত্রী-পুত্রের খাবার যোগাড় কর্ত্তে পারি না—আমি আবার—"

"সেইজন্যেই এখন তোমায় আমার সাহায্য করা উচিত। চাকরিটা পেলে সবই হবে—"

"যদি পাও! সে যতদিন আছে ততদিন তুমি তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। তার মতন কেউ গাইতে পারে না।"

"সে ভারি দুষ্টু" নিনা মৃদুস্বরে বলিল।

"হ্যাঁ নিনা, সে ভারি দুষ্টু—রাক্ষসী নিনা রাক্ষসী!"

নিনা স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। আশাদেবী তাহার অন্তরে আশ্বাসবাণী ঢালিতেছিলেন, সে বলিয়া উঠিল "রিচার্ড প্রিয়তম, হতাশ হ'ও না। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব, শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ব। ভগবান নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন। চাইবেন না?"

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন নিনা তাই হ'ক।" রিচার্ডের কথা শেষ হইতে না হইতে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল নীচে একজন স্ত্রীলোক ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিতে চাহিতেছে, সে তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে কিছুতেই যাইতে চাহে না, বলে বিশেষ দরকার।

"আচ্ছা তাঁকে বস্‌তে বল, আমি যাচ্ছি" বলিয়া নিনা স্বামীর মুখপানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল।

২

নিনা অপরিচিতার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিল। টেবিলের উপর ল্যাম্পটি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, অপরিচিতা চিন্তিতভাবে মস্তক নত করিয়া কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া সম্মুখে নিনাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনিই বোধ হয় মিসেস্ এ্যাংগ্যাস্।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি কিছু বল্‌তে চান ?"

"হ্যাঁ, আমি থিয়েটারে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব ভেবেছিলুম, কিন্তু তার পূর্ব্বেই আপনি সেখান থেকে চলে এসেছেন। এইটিই কি রিচার্ড এ্যাংগ্যাসের বাড়ী।"

"হ্যাঁ, এইটিই আমাদের কুটীর" একটু বিরক্তভাবেই নিনা এই কথা কয়টি বলিল।

ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অপরিচিতা বলিল "বড়ই দুঃসময় যাচ্ছে না ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তা'তে অপরের কিছু এসে যায় না বোন।"

"তা বটে, তবে আমার কিছু আসে" বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল, পরে পুনরায় বলিল "বোধ হয় তুমি বুঝেছ, আর যদি

না বুঝে থাক তো শোন—আমিই রিচার্ডের পূর্ব্ব স্ত্রী—ডিকির মা—সে কথা বোধ হয় তুমি অস্বীকার কর্বে না। তাকে নিয়ে যাবার জন্যে আজ আমি নিজে এসেছি।"

নিনার মুখের ভাব একটুও পরিবর্ত্তন হইল না। সে একটু রুক্ষভাবেই বলিয়া উঠিল "তা' হ'লে তুমি কি আমাদের এই দুঃসময়ে কষ্ট দেবার জন্য এসেছ ?"

"মোটেই না—শুন্‌লুম তোমাদের বড় দুঃসময় তাই——হ্যাঁ, তাঁর নাকি বড় অসুখ।"

নিনা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

"তিনি কি আর গান গাইতে পার্বেন না ?"

"এখন তো নয়, তবে আশা করা যায় যত্ন কর্লে পরের বছর তাঁর স্বর আবার ভাল হতে পারে।"

"যত্ন কর্লে—এই বাড়ীতে আমি তো ভাই এক হপ্তা থাক্‌লে আর গাইতে পারি না। ওঃ এই স্যাঁতসেঁতে ঘর—গলার আর দোষ কি—হ্যাঁ, ডিকি কেমন আছে ?"

নিনা কোন উত্তর না দিয়া গৃহের বাহিরে যাইতেছিল, রমণী বাধা দিয়া বলিল "রাগ কর্লে, তা এটা স্বাভাবিক। আমরা দু'জনে দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বী। শুন্‌লুম তুমি আজ গান গাইছ, তাই গিয়েছিলুম। বেশ গাইলে, কিন্তু কাজটা বোধ হয় পেলে না।" একটু শ্লেষপূর্ণস্বরে এই কথা কয়টি বলিয়া

ভেরোনি নিনার মুখের প্রতি চাহিল। নিনা কোনই উত্তর করিল না দেখিয়া ভেরোনি একটু রাগান্বিতা হইল। লোকের স্বভাবই এই যে যদি কলহকারীর সহিত মুখোমুখি উত্তর করা যায়, তাহা হইলে সে অনেকটা শান্ত হয় এবং কলহের নিবৃত্তি সেই স্থলেই হইয়া যায়, নতুবা সে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, তাহার রাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। একটু থামিয়া ভেরোনি পুনরায় বলিতে লাগিল "রিচার্ড বোধ হয় তোমাকে আমার সম্বন্ধে অন্য রকম বলেছে—আমার গলার স্বর মিষ্টি নয় ইত্যাদি—কেমন না? কিন্তু কি কর্ব্বে বল, সাধারণে এই দুষ্ট স্ত্রীলোকটিকেই চায়, ম্যানেজার সেটা বিলক্ষণ জানে।"

"তা হ'লে তোমারই জিত।"

"তোমরা কি কর্ব্বে—উপোষ না ভিক্ষে?"

"সে বিষয়ে তোমার কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে যাব না, আর তোমার দোরে হাত পাততেও যাব না।"

"রাগ কচ্ছ কেন? বস, কাজের কথা বলি, মনে রেখ এর ওপর তোমাদের সুখ দুঃখু নির্ভর কচ্ছে।"

"তোমার প্রয়োজন কি বুঝতে পার্চ্ছি না?"

"প্রয়োজন বিশেষ কিছুই নয়, আমার ন্যায্য প্রাপ্য আমায় দাও—আমার ছেলেকে আমায় ফিরিয়ে দাও, তা' হ'লেই আর কোন গোল থাকে না, বুঝলে?"

ভেরোনি উত্তরের প্রতীক্ষায় নিনার মুখপানে চাহিল। উভয়েই নীরব। একখানি সুখের সুন্দর মোহন ছবি নিনার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আবার যেন সহসা নিরাশার মেঘে ঢাকা পড়িতেছিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল "কি বল্লে, ডিকিকে তোমায় দেব ?"

ডিকির সুন্দর মুখখানি তাহার বলিষ্ঠ দেহ এবং ভেরোনির দানবী প্রকৃতির কথা নিনার স্মৃতিপথে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগিল। অবশেষে সে জোর করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "না—না ডিকিকে আমি ফিরিয়ে দেব না—আর তার ওপর তোমার কোন অধিকার নেই, স্ব-ইচ্ছায় তুমি তোমার অধিকার ত্যাগ করেছ, এখন আর সে অধিকার পেতে পার না।"

ভেরোনি এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, সেইজন্য সে প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ শুনিয়া তাহার বিশ্বাসই হইল না যে লোকে এতটা স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, তাহার পর বলিল "কথায় বলে না 'মার চেয়ে যে ভালবাসে তারে বলে ডান' এও সেই রকম। আচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর, কাল পর্য্যন্ত সময় দিলুম, ভেবে দেখ, মনে থাকে যেন তোমাদের সুখ দুঃখু এর ওপর নির্ভর কচ্ছে।"

"তোমার যা কর্ব্বার থাকে কর্ত্তে পার" নিনা ধীরভাবে

উত্তর করিল। ভেরোনি রাগে অধীরভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল। পথে গাড়ীতে একজন রমণী তাহার অপেক্ষা করিতেছিল, ভেরোনি আসিয়া গাড়ী চালাইতে হুকুম দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে অপরা রমণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "দেখ্‌লে আক্কেলটা বলে কি না ডিকিকে দেবে না, আচ্ছা দেখা যা'বে। কাল আমি তো গান গাইব, দেখি কাজ কেমন পান। ডিকিকে দেন কিনা।" কথা সমাপ্ত হইলে ভেরোনি চুপ করিল, পথিমধ্যে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। গাড়ী যথাক্রমে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া থামিল। উভয়েই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

* * * * *

৩

ভেরোনি আর্সির সম্মুখে বসিয়া মুখে পেণ্ট লাগাইতেছিল, দূরে একটি রমণী একখানি ইজি-চেয়ারে শুইয়াছিল। ভেরোনির মনে আজ শান্তি নাই। যে রমণীটি ইজি চেয়ারে শুইয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল "আচ্ছা স্ত্রীলোকের সপত্নী-বিদ্বেষ কি স্বাভাবিক। তার ওপর তুমি কেন রাগ কচ্ছ আমি কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না।"

"না রাগ কর্ব্বো না, গা জল করে দিলে আর কি, আমার প্রাণের বাছাকে আমাকে ফিরিয়ে দিক না, আমি তো তাদের সে কথা আজ বলে এসেছি।"

"সে দোষ কি——তা——র" বলিয়া আর বলিতে রমণী সাহস করিল না। যখন দু'জনে এই রকম কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় চাকরাণী আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "আপনাকে বিরক্ত কর্ত্তে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, তবে আপনি বলেছিলেন যে এই নামের—" কথা শেষ করিতে না দিয়া ভেরোনি তাহার হস্ত হইতে কার্ডখানি কাড়িয়া লইল।

নাম পড়িয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল "ওঃ রিচার্ড নিজেই এসেছে, আচ্ছা এইখানেই নিয়ে এস।"

সমস্ত নীরব, সান্ধ্যসমীরণ ভেরোনির অবিন্যস্ত চুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যরশ্মি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়ায় তাহা রক্তিমাভ ধারণ করিয়াছিল। সন্ধ্যাবধূও বুঝি ভেরোনির ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়া নিশানাথের আশাপথ চাহিয়া বসিয়াছিল। এমন সময় একটি সুন্দর ইটন্-সুট্-পরিহিত বালক প্রবেশ করিয়া বলিল "ক্ষমা কর্ব্বেন, একটু দোষ হয়েছে আমি———।"

বালককে আর বলিবার অবসর না দিয়া ভেরোনি একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল "কে তুমি বালক? আমি মিঃ এ্যাংগ্যাসের উপস্থিতি আশা করেছিলুম, তোমার কি দরকার?"

"আমি তাঁর ছেলে, বাবার একখানা কার্ড নিয়ে এসেছিলুম, তাই এই বিভ্রাট; কিছু মনে কর্ব্বেন না।"

ভেরোনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিল "না—না, ডিক্ এস এস, ও তোমায় বুঝি তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন? এস বাবা" বলিয়া ভেরোনি বালককে বুকের মধ্যে লইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিল। বালক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল "আমার নাম রিচার্ড, আমাকে কেউ পাঠিয়ে দেন নি,

আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি। আচ্ছা আপনি আমার নাম জান্‌লেন কি করে, মা আমাকে ঐ নামে ডাকে ?"

ভেরোনি হতাশভাবে চেয়ারে উপবেশন করিল। এক মুহূর্ত্তে তাহার আশা-লতিকা শুকাইয়া গেল, তাহার শূন্যের উপর তাসের বাড়ী একটি ফুৎকারে ভূমিসাৎ হইল। পরে অতি কষ্টে বলিল "তা' হ'লে তুমি নিজে এসেছ, আমার সম্বন্ধে সব শুনেছ ?"

"হ্যাঁ, মা আপনার বিষয় অনেক কথা বলেছেন। আজ আপনি গাইবেন। আর আপনি খুব ভাল গান—না ?"

"হ্যাঁ—তা' হ'বে। তুমি কি আমার সম্বন্ধে আর কিছু—"

"না আর কিছুই না, তবে—" বালক একটু থামিল, পরে পুনরায় বলিল "দেখুন কেউ জানে না যে আমি এখানে এসেছি, মা পর্য্যন্ত না।"

বালককে বাধা দিয়া ভেরোনি বলিল "আচ্ছা, তুমি তাকে মা বল কেন, সে তো তোমার মা নয় বাবা, তোমার মা—" ভেরোনি আর বলিতে পারিল না, তাহার গলা যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছিল। আজ কপালদোষে তাহাকে তাহার পুত্রের নিকট পরিচয় দিতে হইবে এই চিন্তা তাহাকে কশাঘাত করিতেছিল।

"কেন আমার মা তো বাড়ীতে আছেন। আপনি ও কথা বল্‌ছেন কেন?"

"না বাবা তোমার মা অনেক দিন মারা গেছেন—ওঃ—"

"তা' হ'লে তিনি আমার খুব ছেলেবেলায় মারা গিয়েছেন —না?"

ভেরোনি ধীরে ধীরে ডিকির নিকটবর্ত্তী হইয়া কাঁধের উপর তাহার হাত দু'খানি রাখিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিল "আচ্ছা তোমার মার কথা কিছু মনে নেই।" বাধা দিয়া ডিকি বলিয়া উঠিল "থাক্‌ সে কথা, আমি আপনাকে একটু অনুরোধ কর্ত্তে এসেছি, আশা করি হতাশ হ'ব না।"

ডিকির কথায় বোধ হইল সে যেন তার মা'র কথা একজন অপরিচিতার সঙ্গে কহিতে অনিচ্ছুক। ভেরোনি সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল "আহা তোমার মা'র সঙ্গে আমার কত বন্ধুত্ব ছিল।" একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বক্ষ আন্দোলিত করিয়া কণ্ঠেই মিলাইয়া গেল।

"ওঃ সেই জন্যে আপনি আমায় ডিকি ডিকি করে ডাক্‌ছিলেন, আচ্ছা দেখুন দিকি এটা কি আমার সেই মা'র ছবি।"

বালক একখানি অস্পষ্ট ফটো পকেট হইতে বাহির করিয়া ভেরোনির হাতে দিল। ফটোখানি একটি যুবতীর,

হস্তে কতকগুলি সঙ্গীতের গৎ, মুখ সরলতাপূর্ণ, সকল অঙ্গে যেন সৌন্দর্য্যের ঢেউ বহিতেছে। সম্মুখের আর্সিতে ভেরোনির মুখ প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। ভেরোনি ফটোর সহিত আপন মুখ মিলাইতেছিল—কত প্রভেদ দু'য়ের ভিতর। কলের পুতুলের মত "বেশ মুখখানি" বলিয়া ভেরোনি ছবিখানি ডিকির হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। তারপর "হ্যাঁ কেন এসেছ বাবা।" বলিয়া ভেরোনি বালককে চুম্বন করিল। রুদ্ধ মাতৃস্নেহ বুঝি হৃদয়ের দু'কূল ছাপাইয়া পড়ে।

"শুনলুম আজ আপনি গাইবেন, মা বলছিলেন আপনি তাঁর চেয়ে ভাল গান করেন—তা' হ'লে—মা এই কাজটা—পান না—এর উপর আমাদের সব নির্ভর কচ্ছে। বাবার অসুখ—টাকার বিশেষ দরকার—যদি আপনি গান না গান তা' হ'লে কাজটা মা পান—বড়ই উপকার হয়—আপনার তো আর অভাব নেই ?"

ভেরোনির মনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতেছিল, অবশেষে স্নেহেরই জয় হইল। বালককে বুকের মধ্যে লইয়া চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া ভেরোনি বলিয়া উঠিল "যাও বাবা, তাই হবে। তোমার স্বর্গগতা মার স্মৃতিরক্ষার্থ আমি তোমার কথায় সম্মত আছি।"

ডিকি এরূপ উত্তর এত শীঘ্র আশা করে নাই। আহ্লাদে

তাহার বুকের মধ্যে ঢিব্ ঢিব্ করিতেছিল। সে ক্ষণিক ভেরোনির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "তবে আসি মা"—ইহার বেশী বলিবার বোধ করি তাহার তখন ক্ষমতা ছিল না। "একটি চুমু বাবা" বলিয়া ভেরোনি ডিকিকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিল। ডিকি একটি চুম্বন করিয়া দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল। মার নিকট যাইয়া এই সুখবর দিবার জন্য তাহার প্রাণ হাঁপাই হাঁপাই করিতেছিল। ডিকি চলিয়া যাইবার পর ভেরোনি মুখের পেণ্ট তুলিতে তুলিতে ইজি চেয়ারে শায়িতা রমণীকে বলিল "ভাই ম্যানেজারকে বলে পাঠাও আমি আজ গাইতে পার্ব্ব না, আমার শরীর অসুস্থ, আর জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নাও, আজ রাত্তিরের গাড়ীতে বিদেশে যেতে হবে। রমণী কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। ভেরোনি দু'হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

*　　*　　*　　*　　*

পরদিন প্রাতে সকলে দেখিল, দ্বারে তালা বন্ধ। 'বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে' টাঙ্গান রহিয়াছে।

শেষ পত্র

"কেমন আছ হে? আমার কথা মত চল ফণী, বুঝেছ?"

ফণী একখানি পুরাতন মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মুখ তুলিয়া দেখিল। পেগুতে ডাক যাইতে প্রায় ২।৩ মাস লাগে; কাজে কাজেই পুরাতন মাসিক পাঠ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, বিশেষতঃ রোগ-শয্যায়, যখন দিনগুলা দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় কাটিতে চায় না।

"এই রকম একলা থেকে থেকে তুমি দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছ হে; নিজের চেহারাটার দিকে একবার চেয়ে দেখ না, কেবল হাড় ক'খানা সার হয়েছে।"

"এ রকম ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌লে আর এর চেয়ে কি নধর কান্তি চেহারা হবে, সেটা তো দেখতে হবে?" ফণী ধীরে ধীরে এই কথা কয়টি বলিল।

ডাঃ সুশীলকুমার বাঙলোয় চতুর্দ্দিকে পায়চারি করিতে লাগিলেন। বাঙলোয় চতুর্দ্দিকে উচ্চবৃক্ষের ম্যালেরিয়ার আবাস-

ভূমি, বিস্তীর্ণ জলাভূমি। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বলিতে আরম্ভ করিলেন "যাও, যাও আর আমি তোমার কোন কথায় থাক্‌ছি না, যা' বল্‌ছি তা' তো শুনবে না। বিয়ে থা কর তা নয়—আচ্ছা লোক যা'হোক।"

"কি কর্ব্বো বল। উপায় নেই। স্বীকার কচ্ছি যে আমিও তোমাদের পাঁচজনের মতন থাকতুম, যদি না দেশে একটি অনাঘ্রাত কুসুম আমার আশাপথ চেয়ে থাকত। মানি যে চার পাঁচ বছর তাঁরা চুপ করে, কি ভরসায় থাকবেন, আর যখন মেয়ে কুৎসিত নয়। তবুও আমি যদি তার প্রতি অবিচার করি তা' হ'লে সেটা কি ধর্ম্মে সইবে, না আমিই সুখী হতে পার্ব্বো।" ফণী চুপ করিল।

ডাক্তার শিশ্ দিতে দিতে বলিলেন "ঠিক্, কিন্তু একজন পুরুষের পক্ষে তার প্রতি অনুরক্ত থাকাও কি ভীষণ পরীক্ষা নয়? আর তুমি তো জান, আমার যার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সব ঠিক্‌ঠাক্, কিন্তু বিধির লিখন, মাঝখান থেকে সব ওলট পালট হয়ে গেল। হ্যাঁ, তার বয়স কত?"

"কত আর—তখন ছিল বার আর এই দু'বছর, হ'ল তোমার চোদ্দ বছর।"

"পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বোধ হয়, গো-বেচারী, জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই?" ডাক্তার হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন। ফণী

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "না—না—তাদের সহরেও বাড়ী আছে, দেশেও আছে, আর তাঁরা একটু নব্য ধরণের, আমি বরং ঠিক্ তার উপযুক্ত নই। আমার এখানকার চাকরি হয়ে গেলেই তাঁরা বিয়ে দিতে রাজী। যাক্ এ সকল কথায় কোন নতুনত্ব নেই, কি বল, তোমার বোধ হয় ভাল লাগ্‌ছে না।"

"না—না, বেশ লাগ্‌ছে, এখানে এসে নভেল বড় একটা পড়া হয় নি ; শোনা যাক্, রোমান্সটা মন্দ নয়।"

"দেখ এই কাজটায় কিছু যাহোক্ পাবার আশা আছে, তারপর দেশে একটা কাজ জুটিয়ে নেব, তা' হ'লে একরকম করে চলে যাবে। দেখ, সে নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসে, এখানে প্রত্যেক ডাকেই তার চিঠি পাই, তার বাপ এতে কোন দোষ দেখেন না।"

"আরে ছোঃ, তাতেই তুমি ভুলে গেছ। কালীও সস্তা আর উচ্ছ্বাসভাব তো আর কিছু অমূল্য নয়, লিখলেই হ'ল।"

"কিন্তু চিঠি লেখায় তার একটু বিশেষ ক্ষমতা আছে।"

"ও সে তো প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই আছে ভাই ; আমি আমার ভাবী স্ত্রীর কাছ থেকে যে সব চিঠি পেয়েছিলুম তা বোধ হয় তুমি দেখেছ। আমি সে সমস্তই রেখে দিয়েছি, যখন

কাজ-কর্ম্ম থাকে না, একটু হাসবার ইচ্ছে হয় তখন সেগুলা পড়ি। তোমার বৌদি দেখে চটে যান, পুড়িয়ে দেবার ভয় দেখান। যাক্ এখন উঠতে হবে, জ্বরটা দেখ দিকিনি।"

ডাক্তার ফণীর হস্তে থার্ম্মোমিটারটা দিলেন, ফণী জিহ্বার তলায় সেটি দিয়া বিছানায় শুইল। সমস্ত বহির্জগৎ নিস্তব্ধ, কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল বারান্দায় ফণীর টেরিয়ার কুকুরটি ধুঁকিতেছে, আর ডাক্তার উৎসুকপূর্ণ হৃদয়ে রোগীর প্রতি চাহিয়া আছেন। ফণীকে আজ বড়ই পীড়িত বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু সে তো কাহারও কথা শুনিবে না। যাহা হউক আর বৎসর দেড়েক, তারপর—তারপর তার কত দিনের আশা পূর্ণ হইবে।

"দু' মিনিট।"

ফণী থার্ম্মোমিটারটি ডাক্তারের হাতে দিল। তাহার পর বালিসের তলা হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া ডাক্তারের সম্মুখে রাখিল। সে তাহার জ্বরের একটা ধারাবাহিক হিসাব রাখে, যাহা তাহার ন্যায় লোকের পক্ষে রাখা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, আর যখন জ্বর ১০৩·৬ এবং ১০৪·৩ এই দুই সংখ্যার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, কমেও না বাড়েও না।

"কত?"

"১০৩·৫।" ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন। কি এক

অব্যক্ত কারণে জানি না ডাক্তারবাবুর এই লোকটির উপর কেমন একটা স্নেহ—ভালবাসা পড়িয়াছে, বিশেষতঃ আজিকার এই ব্যাপার শুনিয়া।

"আচ্ছা বোধ হয় তুমি ডাক্ পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছ, না? আর চিঠিখানি পেলেই বোধ হয় জ্বর নর্ম্মাল বা তার কাছাকাছি হবে, কেমন নয়?"

কথা শেষ করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন "তা' হ'লে এই অসুধটা আনিয়ে নিও, বুঝলে? Good-bye" বলিয়া ডাক্তারবাবু বাঙলোর বাহির হইয়া গেলেন। ফণী চুপ করিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, সে আর বর্ম্মায় থাকিবে, না দেশে যাইবে। যাহা হউক সে কিছু সঞ্চয় করিয়াছে, আর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া বেচারার দেহে ও মনে বড় আর কিছুই নাই, আর পারে না। এই রকম অবস্থায় তাহার ভাবী পত্নীর পত্রগুলি টনিকের কার্য্য করে, সেই জন্য সে বিছানা হইতে উঠিয়া পত্রের বাক্স হইতে খান দুই তিন পত্র বাহির করিল। নীল খামের মধ্যে পত্রগুলি পুরা, উপরে স্ত্রীলোকের হাতের ঠিকানা, তবে বেশ পরিষ্কার—সুন্দর লেখা। একখানি খামের মধ্যে পুরাতন ফটো ছিল, সেখানি বাহির করিয়া ফণী দেখিতে লাগিল। কালের হস্ত হইতে ফটোটি নিষ্কৃতি পায় নাই, অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু

স্মৃতি সেই পুরাতন ফটোখানিকে যে রঙটি যেখানে দিলে তাহা চিত্রের অধিকারিণীর ন্যায় দেখায়, অর্থাৎ চুলে কাল রঙ, চক্ষে নীল, বিম্বাধরে লাল আর ঠোঁট দু'খানির পার্শ্বে নির্ম্মল শুভ্র হাসি যেন ফুটিয়া রহিয়াছে, এই রকম করিয়া ফণীর চোখের সম্মুখে ধরিতে লাগিল। ফণী অনেকক্ষণ দেখিল, তৃষ্ণা মিটিল না, অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিল, তাহার পর পাগলের ন্যায় কথা কহিতে লাগিল, পরে একটি তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে একখানি পত্র লইয়া পড়িতে লাগিল—প্রত্যেক বর্ণটি বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া পড়িতে লাগিল—

"প্রিয়তম,

এ হপ্তায় কাজের ঝঞ্ঝাটে বড় ব্যস্ত ছিলুম, আজ একটু সময় পেয়ে তোমায় চিঠি লিখছি। কিছু মনে ক'র না। তুমি কি ভাববে বলতে পারি না, কিন্তু আমি স্বপ্নে প্রায়ই তোমাকে চিঠি লিখি। প্রিয়তম, কখন কখনও স্বপ্নে দেখি যেন আমি তোমার সঙ্গে কথা কইছি—ওঃ তখন কি আনন্দই হয়। সেদিন আমরা সব থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, থিয়েটার থেকে এসে তোমায় চিঠি লিখব বলে বসলুম, লিখতে লিখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তা খেয়ালই ছিল না। ভোরবেলা ছোট বৌদি যখন জাগিয়ে দিলে তখন উঠে দেখি মেঝেতে কালী কলম নিয়েই শুয়ে আছি। ঠাট্টার

চোটে তো মাটীর সঙ্গে মিশুতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু বলতে কি ওর ঠাট্টাগুলো আমার ভারি মিষ্টি লাগে। যাক্, তুমি কবে আসছ? জীবনটা বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। আমাকে কি তোমার এখনও মনে আছে—আর জান, আমি এখনও সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই, তুমি কি মনে ক'রছ বল্‌তে পারি না, হয় ত পাগলামি মনে ক'রছ, কিন্তু জান তুমি যে সব খুঁটিনাটি চিহ্নগুলি আমার মুখে দেখতে ভালবাসতে, আমি সেগুলি সেই রকম করে রাখি—কার জন্যে জান প্রিয়তম? তোমার জন্যে, কেন জান? পাছে এই দীর্ঘ দিবসের পর বাড়ী এসে আমাকে সেই রকম দেখতে না পেয়ে চিন্‌তে না পার। তুমি বোধ হয় এখনও দু'বছর বর্ম্মায় থাকবে, কিন্তু আমি আর দিন গুন্‌তে পারি না—ওঃ! আচ্ছা, ধর যদি আমার চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে যায়, তা' হ'লে তুমি কি কর? যদি—— আচ্ছা যদি এ রকমই কিছু হয় তা' হ'লে তুমি কি কর প্রিয়তম? আজ এই পর্য্যন্ত, তবে আসি!

ইতি—

যূথী।"

ফণী পত্রখানি পড়িতে পড়িতে শেষের কথাটার একটা উত্তর মনে মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া দিল। পরে পুনরায় সে আর একখানি পত্র লইয়া পড়িতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে

কত কথা—বাল্য-স্মৃতি, কৈশোর-স্মৃতি, বিদায়ের পূর্ব্বদিনের কথা, সেই যখন তারা ছোট ছিল, দু'টিতে খেলিত। কখনও যদি সে তাহাকে তিরস্কার করিত, অমনি সে তাহার ডাগর ডাগর চোখ দু'টি তুলিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত, সেই জলভরা চোখ দু'টি যেন তাহার সম্মুখে ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হইলে সে ডাকে চিঠি দিবার জন্য লিখিতে বসিল ;—

"শেষে আমি এই ঠিক্ করেছি প্রিয়তম, যে এখানে আর এক বৎসরও থাকব না। আমার শরীর মোটেই ভাল নয়, যদি আরও বছর দুই এখানে থাকি তা' হ'লে এইখানেই আমার শেষ হবে। আর এখানকার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। ম্যালেরিয়া ধরলে আর ছাড়ে না। ডাক্তার দেশে যাবার জন্যে বলছে, যাই হোক্ গে দেশে যদি শ'খানেক টাকায় একটা চাকরিও পাই তা' হ'লে আমাদের মন্দ চলবে না। আর এখানে এসে কিছু জমিয়েছি, দেশে একটু ভাল করে বাড়ী কর্ব্বার ইচ্ছে আছে, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সেটা বোধ হয় পূর্ণ হবে। যদিও ঐ সামান্য টাকায় আমাদের মোটামুটি ভাবেই থাকতে হবে, তবুও তার মধ্যে কি একটু নতুনত্ব থাকবে না? কিন্তু যদি এখানে আরও ভবিষ্যৎ সুখের আশায় থাকি তা' হ'লে—তা' হ'লে আর লিখতে পারি না।

ভগবান জানেন প্রিয়তম তোমার জন্যে, তোমার একখানি পত্রের জন্যে আমি কি রকম উৎসুক হয়ে থাকি। ডাকের দিন-গুলো কি দীর্ঘ বলেই মনে হয়, আর পিয়ন আস্‌তে এক মিনিট দেরী হলে আমার কাছে এক যুগ বলে মনে হয়, মনে হয় কি নিষ্ঠুর এই ব্রহ্মবাসীরা, এদের ঘরে কি স্ত্রী-পুত্র নেই, এরা কি আমার মতন চিঠির আশায় বসে থাকে না। আমি কথনও কথনও বসে বসে ভাবি দেশে কি রকমে আমাদের জীবন কাটবে। যথন বাড়ীর কথা মনে হয় তথন যে কি আনন্দ হয়, সেই পুকুর-পাড়ে ফলসা গাছে ওঠার কথা, তুমি একটা ফলসার জন্যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে! এক এক সময় ভাবতে ভাবতে ঠিক্ যেন সেই সব চোথের সামনে প্রত্যক্ষ করি, আর তথন ভাবে এতই বিভোর হয়ে যাই যে কোন কোন দিন থাবার কথাও মনে থাকে না, কিন্তু যথন নির্দয় অসভ্য ব্রহ্মবাসী চাকর ডেকে আমার সুথের সেই গোলাপী নেশা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে থাবারের জন্য ডাকে তথন কি মনে হয় জান?—মনে হয় কি তুচ্ছ থাবার, যার জন্য এই বর্ব্বরগুলো আমার সুথ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল—কেন দিল? তারপর গিয়ে তাড়াতাড়ি দু'টো মুথে দিয়ে সেই স্বপ্নরাজ্যে যাবার চেষ্টা করি, কিন্তু—কিন্তু হায় তথন সেটা যে মনের ভ্রান্তি তা মনে হয়। যাক্ আর বড় জোর দুটো কি তিন্‌টে মাস, তারপর

—তারপর তো তুমি সব জান, পাগলের মত অনেক বকলুম, কিছু মনে কর না। ইতি—

তোমারই—ফণী।"

এইরূপে স্কুলের ছেলের ন্যায় সে পাতার পর পাতা লিখিয়া চলিল। কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল, ফণী উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ডাক্তার সুশীলকুমার গৃহে প্রবেশ করিলেন, ফণীকে দেখিয়া ডাক্তার চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন "কি হে? এর মধ্যে তুমি এ রকম—ব্যাপার কি, খুব ভাবছিলে—চিঠি-পত্তরের কথা বোধ হয়।" বলিতে বলিতে বসিবার ঘরে ঢুকিয়া পত্রখানি দেখিয়া বলিলেন "এই যে চিঠি লিখছিলে, বারণ করলে তো শুনবে না। জ্বর দেখেছিলে?"

"না—বিরক্ত হয়ে গেছি।"

"তা'ত হবেই।"

"না—না, আজ আর জ্বর টর নেই, এস একটু গল্প করি।"

"আচ্ছা হচ্ছে—বগলে থার্ম্মোমিটারটা দাও তো" বলিয়া ডাক্তার থার্ম্মোমিটারটা ফণীর হস্তে দিলেন। মিনিট দুই সমস্ত নিস্তব্ধ। ডাক্তার থার্ম্মোমিটারটি লইয়া আলোর নিকট গেলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ধীরে ধীরে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

"দেখ ফণী, যখন তুমি এই সব কথা বেশী ভাব তখন আমি কোন মতেই জ্বরটাকে কমাতে পারি না। লিখবে বেশী, ভাববে বেশী, কি জ্বালাতনে যে তোমাকে নিয়ে পড়েছি। এখন যদি তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে চাও তো আমি যা বলি তা শোন।"

ফণী কোন উত্তর না দিয়া ঘাড় নাড়িল, সে জানে যে ডাক্তারের কথানুসারে চলা উচিত, তবুও সে জানিয়া শুনিয়াও যে কথানুসারে চলে না কাজেই তাহাকে বিশেষ কিছু বলা বৃথা, কিন্তু সারিয়া না উঠিলে তো বাড়ী যাইতে পারিবে না, সেই ভাবনাই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, পরে বিরক্ত হইয়া যেন বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সুশীল, তুমি যা ব'লবে আমি তাই শুনবো।"

এই ভাবে চলিতে লাগিল, ডাক্তারবাবু নিয়মিত আসিতে লাগিলেন, জ্বর সেইরূপই থাকে। ফণী 'নেয়ারের খাটে' শুইয়া একখানি মাসিকপত্র পড়িতেছিল, ডাক্তারবাবু পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাক্তারবাবু বলিয়া উঠিলেন "ফণী, তুমি নিশ্চয়ই বেশী ভাবছ, কেমন না? ব্যাপার কি খুলে বল দিকিনি, ক'দিন থেকে তোমাকে বড়ই বিমর্ষ দেখছি, কি হে?" অত্যন্ত করুণ-স্বরে ফণী উত্তর দিল "গেল ডাকে চিঠি পেলুম না, তাই ভাবছি,

কখন তো চিঠি বন্ধ হয়নি, তবে তার যদি অসুখ বিসুখ করে থাকে—।" ডাক্তার তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন "চিঠি কি ঠিক্ সময়ে বিলি হয় হে? কাল তো সবে চিঠি বিলির দিন গেছে, আজ বোধ হয় পাবে কিংবা হয়তো কোথায় দিতে কোথায় দিয়েছে, ভেবো না, পাবে ঠিক্।"

ফণী পাশ ফিরিয়া শুইল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল "আচ্ছা ডাক্তার, পরের মাসে ঠিক্ বাড়ী যেতে পার্ব্বো, কি বল? উত্তরের জন্য ফণী তাহার মুখপানে তাকাইল। ডাক্তার কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ফণী আপন মনেই বলিতে লাগিল "উঃ ভেতরে ভেতরে আমাকে ক্ষয় করে ফেলেছে ডাক্তার, কেবল যূথীর আশায় বোধ হয় প্রাণটা রয়েছে।" বলিতে বলিতে ফণী উত্তেজিত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "যূথী, যূথী—আমি এসেছি—দেখ—দেখ—" বাস্তব ও কাল্পনিকের প্রভেদ তাহার কিছুমাত্র তখন ছিল না। সে তখন বিকারের ঝোঁকে তাহার ঈপ্সিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সকল কথা কহিতেছিল। এত শীঘ্র যে বিকারে দাঁড়াইবে তাহা ডাক্তারবাবু ভাবেন নাই; তাহার উপর কয় রাত্রি উপর্য্যুপরি জাগিয়া ঘুমে তাঁহার চক্ষু ঢুলিতেছিল, ফণীও বকিতে বকিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ সব নিস্তব্ধ,

হঠাৎ ফণী পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল "ডাক্তার উঠ—উঠ—যূথী এসেছে—যাও দরজা খুলে দিতে বল—বেয়ারা—বেয়ারা—ঐ যে যূথী—যূথী—যূথী—এই জন্যে বুঝি চিঠি দাও নি—"

সুশীলকুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখেন রোগী ভয়ানক ভুল বকিতেছে।

ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া দিয়া বাতাস করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "কি ব'লছ তুমি, কৈ কেউ তো নেই।"

ফণী একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল "এঁ্যা, তবে কি স্বপ্ন!"

মানুষ কি কখন ও রকম স্বপ্ন দেখতে পারে—কি বলছ—ডাক্তার ঐ যে—ঐ যে সে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওখানে কেন দাঁড়িয়ে যূথী, এই যে আমি—ঐ ঐ—ডাক্তার সে চলে গেল, যাও যাও—ফিরিয়ে নিয়ে এস—রাগ করে বুঝি চলে গেল, যাও—যাও, ফেলে দাও তোমার থার্ম্মোমিটার—কি হয়েছে আমার।" "চুপ কর ফণী, ঠাণ্ডা হয়ে শোও—তিনি আসছেন—দেখি হাতটা তোল—এই—বেশ।"

ফণী যূথীর ফিরিয়া আসার কথায় বোধ করি আশ্বস্ত হইয়া শান্ত বালকের ন্যায় চুপ করিয়া শয়ন করিল। ডাক্তার বাবু জ্বর দেখিলেন ১০৫ ডিগ্রি, দেখিয়া বরফের বেশী করিয়া

ব্যবস্থা দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। এইরূপে বিকারে ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল; ছ'দিন এই ঝোঁক রহিল; মাঝে একদিন—শুক্রবার সে জ্ঞানলাভ করিয়া পত্রের জন্য ডাক্তারের মুখপানে চাহিল, কিন্তু সে দিন 'ডাক' আসিবার কথা নয়, রবিবার 'ডাক' আসিবার দিন, সুতরাং ঐ দু'দিন সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

রবিবার পিয়ন আসিয়া ফণীর একখানি পত্র দিয়া গেল। ফণী ঘুমাইতেছিল, ডাক্তারবাবু এই সংবাদটি তাহাকে দিবার জন্য উৎসুক হৃদয়ে তাহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। এ কয় দিন তিনি রোগীর কাছ হইতে এক মুহূর্ত্তও নড়েন নাই, রোগীর সমস্ত অবস্থা খুব মনোযোগ দিয়া দেখিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমেই তিনি ফণীর জীবনের আশা ত্যাগ করিতেছিলেন। আজ সকাল হইতে তাহার জ্বর নাই; ফণী ঘুম হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ডাক্তার—আজ—কি—বার? চিঠি—পত্তর —কিছু—এসেছে—?"

"হাঁ—এই যে, আর তোমার জ্বরও ছেড়ে গিয়েছে ভাই—চিঠির গুণ আছে।" "পড় ভাই—ওঃ বুঝি এই জন্যেই প্রাণটা রয়েছে—শীঘ্র পড় ভাই।"

ডাক্তারবাবু খামখানি খুলিয়া চিঠিখানির উপর একবার চোখ্ বুলাইয়া লইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, একি!

শ্রীচরণকমলেষু,

তোমার চিঠি পেয়ে জানলুম যে তুমি শীঘ্র বাড়ী আসছ। শুনে পর্য্যন্ত আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে, তাই তোমাকে সব কথা জানাচ্ছি, কারণ আর তোমাকে লুকান বৃথা। আমাকে ক্ষমা কর, সব কথা যে তোমাকে লুকিয়েছি তা তোমার ভালোর জন্তে, কারণ এ খবর যদি তুমি আগে পেতে তা' হ'লে বর্ম্মায় আর তুমি থাকতে না, তা আমি জানি। আর প্রথমে তোমার মনে ভারি লাগত, তারপর ভাবলুম বিদেশে এই চিঠিগুলো তোমায় সান্ত্বনা দিতে পারে তাই লিখেছি। নিজ গুণে সব দোষ ক্ষমা ক'র, কারণ বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে এ রকম চিঠি লেখা খুবই অন্যায়। এখন তুমি আসবে জেনে আমার বুকের বোঝা লাঘব কচ্ছি। আজ প্রায় দু বছর হ'ল আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটি মেয়ের মা ও পরস্ত্রী। আর বোধ হয় আমাকে তোমার তত মনে নেই, আমাকে ভোলবার চেষ্টা ক'র। আশা করি, তুমি আসবে, অন্ততঃ আমাদের তিনজনকে দেখবার জন্তে আসবে। আমার প্রণাম জেনো। ইতি—

ছোট বোন যুথী

পুঃ। এই ক'দিন চিঠি দিতে পারিনি, মেয়েটার ডিফ্‌থিরিয়া হয়েছিল, এখন একটু ভাল আছে।

ডাক্তার যে রোগশয্যার পার্শ্বে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের তাঁহার ভাবী পত্নীর কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, ঠিক্ এই রকম ঘটনা। ফণী চিঠিখানি শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল "কিহে—পড়—"

ডাক্তারবাবুর চমক ভাঙ্গিল। প্রণয়-পত্র কিরূপ হয় তাহা তাঁহার জানা ছিল, তিনি তাঁহার ভাবী পত্নীর নিকট হইতে এরূপ পত্র অনেক পাইয়াছিলেন, আজ তাহা কাজে লাগিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "প্রিয়তম—" "তারপর কি বল ডাক্তার।" ডাক্তারবাবু এই অশুভ-বার্ত্তা দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, বোধ করি একটু হতভম্বও হইয়া গিয়াছিলেন, তবে তাড়াতাড়ি সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন "তোমার এত শীঘ্র বাড়ী আসার কথা শুনে আমি যে কি রকম আনন্দিত হয়েছি তা আর লিখে কি জানাব। আহ্লাদে কি যে লিখব ভেবে পাচ্ছি না। এখন বুঝছি যে আহ্লাদে নাচতে যে ইচ্ছে করে কথাটা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়, তবে নেহাৎ কেউ দেখে ফেলবে, বিশেষতঃ ছোট বৌদি— তাই আমি আর তা পালু'ম না। হ্যাঁ, ক'দিন চিঠি দিতে পারি নি বলে কিছু মনে ক'র না। আমার অসুখ করেছিল, তবে বিশেষ কিছুই নয়, এখন ভাল হয়েছি। সাক্ষাতে সকল

কথা বলব, আজ তবে বিদায় প্রিয়তম। পরের চিঠিতে অনেক কথা লিখ্‌ব। ইতি—

"যূথী—যূথী—ডাক্তার আজ তুমি যে উপকার করলে তা—যে কি বলে প্রকাশ ক'রব— তা আমি—ভেবে পাচ্ছি না —ডাক্তার—কত—বেলা ?

"ডাক্তার আমার হয়ে তাকে একখানা চিঠি দাও—আমার কথা সব খুলে লিখে দাও—আমার বোধ হয় শেষ হচ্ছে—ডাক্তার যখন তুমি—দেশে—যাবে—তখন—তাদের—বাড়ী—গিয়ে আমার—শেষ কথা—তাকে বিয়ে—কর্ত্তে—বোল—।"

সব নিস্তব্ধ। রোগীর নিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন কিছুই শুনা যাইতেছে না! ফণী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "ডাক্তার—চি—ঠি —খা—না—আমা—র—হাতে—দা—ও—।"

ডাক্তারবাবু ফণীর হস্তে পত্রখানি রাখিলেন।

"হাঁ—ঠি—ক্—হয়ে—ছে—এই—টে শুদ্ধ—আ—মা—য় —পু—ড়ি—ও—।" ধীরে ধীরে ফণী পাশ ফিরিয়া শুইল। ডাক্তারবাবু প্রায় মিনিট দশেক প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন, তাহার পর একখানি চাদর দিয়া তাহার মৃতদেহটি আচ্ছাদিত করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—সব ফুরাইল।

রাজার ডাকে

সে প্রায় বছর দুয়েকের কথা, হেমেন রায় তখন সবে বিবাহ করিয়াছে। জীবন তখন তাদের নিকট কুসুমাবৃত শয্যা, গন্ধে ভরপুর। ঘরে বিদুষী স্ত্রী হেমলতা—শান্তি ও কমনীয়তার প্রতিচ্ছবি যেন র‍্যাফেল-অঙ্কিত একটি সজীব মাতৃমূর্ত্তি।

হেমেন ছেলেবেলা হইতে কবি, আর আজকালকার চিত্রকরদিগের মধ্যেও সে একজন নগণ্য ব্যক্তি নহে। তাহার বহু চিত্র অনেক প্রদর্শনীতে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছে, ইহাতে তাহার আয়ও মন্দ হয় না; তাহার উপর হেমলতার বইগুলি বাঙলার পাঠকপাঠিকাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। মাসিক পত্রিকার পাঠকপাঠিকা প্রথমেই দেখেন হেমলতার কোন গল্প সে মাসে আছে কিনা, সুতরাং বোঝা যায় তাঁর বইগুলি পোকায় নষ্ট করে না, মানুষেই নষ্ট করে। কাজেই ইহা বলাই বাহুল্য যে পেটের ধান্দায় হেমেনকে ঘুরিতে হয় না বরং স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য আজ চিঁড়িয়াখানা কাল মিউজিয়াম

তারপর দিন বায়োস্কোপ এইরূপে প্রত্যহই একস্থানে না একস্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত। বাস্তবিক তাহাদের সুখনদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, বুঝি বা কূল ভাসাইয়া দেয়।

হেমেন তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিল, হেমলতা ঝড়ের মতন ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল "হ্যাঁগো, আজকে চিঁড়িয়াখানা গেলে হয় না? আর তোমার সেই বইখানা বা'র কর্ব্বার কি কর্লে? বল্লে যে চিত্রকলা সম্বন্ধে ও রকম বই বোধ হয় এই প্রথম—কি হল?" কথা শেষ করিয়া হেমলতা উত্তরের আশায় স্বামীর মুখপানে চাহিল।

"হ্যাঁ, প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা এক রকম হয়ে গিয়েছে লতা, বই প্রেসে দিয়েছি" কথা শেষ করিয়া হেমেন কাগজপত্তর গুছাইতে লাগিল, ইত্যবসরে লতা কাপড় পরিয়া গাড়ী জোতাইয়া একেবারে উপস্থিত, হেমেন তখনও কাগজ গুছাইতেছে। স্বামীকে তখনও এই অবস্থায় দেখিয়া লতা তাড়াতাড়ি আন্‌লা হইতে একটা পাঞ্জাবী ও পাম্প-সু জোড়া স্বামীর পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। মন্ত্রমুগ্ধ হেমেন যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। গাড়ী চলিতে লাগিল, ধর্ম্মতলার মোড়ের নিকট

শোনা গেল কাগজওয়ালারা হাঁকিতেছে 'বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কো'র—বাঙ্গালী-লোক লড়াইয়ে যাচ্ছে,—নায়ক—দৈনিক বসুমতী—বাঙ্গালী—বাবু—বাঙ্গালী—।'

কথাটা শুনিয়া লতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁগা, সত্যি সত্যি বাঙ্গালীরা যুদ্ধে যাচ্ছে? ওঃ, কি ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধ—"

"কেন লতা, আমরা কি মানুষ নই?"

"যাও, আমি বুঝি তাই ব'ল্‌ছি।"

"কেন তুমি কি এ ক'দিন কাগজ পড় নি—এরা যাচ্ছে জীবন দান কর্ত্তে—আর্ত্তের যন্ত্রণা দূর কর্ত্তে—হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সেবা কর্ত্তে, প্রাণ দান কর্ত্তে—হনন কর্ত্তে নয়।"

"তুমি রাগ ক'রলে? না—না, আমি বলছিলুম যে এই সব ছেলেরা কত স্নেহময়ী মাতার বক্ষশূন্য করে চলেছে, কত প্রিয়তমা পত্নীর চক্ষের জলের কারণ হয়ে চলেছে। ফিরবে? তাই বা কে জানে?"

"কি লতা কেঁদে ফেল্লে?"

"না—ও কিছু নয়।" বলিয়া লতা চক্ষু মুছিল। কথাটা চাপা দিয়া হেমেন তাহার পুস্তক সম্বন্ধে কথা তুলিল। পুস্তক বিক্রয়ের টাকা হইতে কি কি ক্রয় করা হইবে তাহারও একটা তালিকা গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া হইয়া গেল। গাড়ী চিঁড়িয়া-

থানায় পৌঁছিল। দু'জনায় মিলিয়া সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তদেহে ঝিলের পার্শ্বে 'টিফিন কেরিয়ার' লইয়া খাইতে বসিয়া গেল। লতা তো প্রথমে খায়ই না, পরে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর দু'একখানা ফল মুখে দিল। ইত্যবসরে হেমেনের এক মামাতো ভাই খাঁকি-পোষাকে সজ্জিত হইয়া অপর দু'টি যুবকের সহিত তথায় উপস্থিত "হেমেন দা যে, কি হচ্ছে?—এই যে বৌদিও" বলিয়া সনৎ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"একি তোমরা কি এ্যাম্বুলেন্সে যাচ্ছ নাকি হে?"

"হ্যাঁ দাদা, এই মাস তিনেকের ভেতর আমরা রওনা হব। এদের বোধ হয় তুমি জান? সতীশবাবুর ভাই এটি; আর এটি তাঁর ভাগ্নে।" বলিয়া যুবক দু'টির প্রতি সনৎ একবার দৃষ্টিপাত করিল।

"ওঃ সতীশের ভাই তুমি, তা বেশ,—বেশ দেশের মুখ উজ্জ্বল কর ভাই।"

"আপনারাও আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন হেমেনবাবু। তা' না হ'লে শুধু বাক্যবীর হলে তো চল্‌বে না। 'আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই যে চিরকাল রয়ে যাব।"

শিখণ্ডিকে সম্মুখে রেখে অর্জ্জুন যে রকম কৌরবগণের উপর বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন শুন্‌তে পাই, আমাদের সতীশ-

বাবুর ভাইও যে বাক্যের আড়ালে শ্লেষ-বাণ হেমেনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন তা যে সে বাণের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয় তা' যাঁরা তাঁর মুখের তাৎকালীন অবস্থা একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন তাঁরাই বুঝেছিলেন। সতীশ-বাবুর ভাই চুপ করিলে হেমেন একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া লতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল "আমাদের পায়ে যে শিকলী রয়েছে, দেখছ না? এ শিকলী কাটতে একটু জোর দরকার হয়, সে বল কি আমাদের আছে ভাই। কি বল লতা?" বলিয়া হেমেন লতার প্রতি একটি সস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। লতা তাহার উত্তরে একটি ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিল। ভাবটা যাও না—আমি কি তোমায় বেঁধে রেখেছি। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সনতের প্রতি ফিরিয়া বলিল "না ঠাকুরপো, দেখছ না ওঁর এই শরীর, এতে কি অত কষ্ট সহ্য হবে, না—না, ওঁর যাওয়া হতে পারে না।"

"আচ্ছা বৌদি আমাদের খাঁকি পোষাকে কেমন মানিয়েছে বলুন দিকি?"

"চমৎকার!"

"সেইজন্যেই তো পোষাক পরেই ছবি তুলিয়েছি। আপনাকে আমাদের গ্রুপের এক কপি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু বৌদি যাই বলুন হেমদাকে খাঁকিতে যা মানায়।"

"কি বল্‌ছ তুমি ঠাকুরপো, ওঁর যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা, না—তা হতে পারে না—এ অনুরোধ অন্যায়—।"

সতীশবাবুর ভাই অপ্রস্তুত হইয়া মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হেমেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "তুমি বুঝছ না লতা ?"

"খুব বুঝেছি সেইজন্যেই বল্‌ছি তোমার যাওয়া হতে পারে না।"

বাস্তবিক এটা সত্য যে হেমেনের শরীরটা তত ভাল নয়, আর সেটা স্নেহময়ী পত্নীর তত্ত্বাবধানে এত রোগপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল যে ধনী সৌখীন-বাবুদিগের বাগানে যত্নে রক্ষিত শীতপ্রধান দেশের গাছের ন্যায় একটু নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে বুঝি বা শুকাইয়া যাইবে। শরীরের অবস্থা এইরূপ হইলেও হেমেন যে কোন কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইত তাহা বলিতে পারা যাইত না, কারণ পাড়ার অবৈতনিক সকল কার্য্যেই সে প্রধান উদ্যোগী ছিল। সেইজন্য যুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দিতেছিল। তাহার পুরুষত্ব তাহাকে উৎসাহিত করিতেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এই সকল যুবকের সহিত কার্য্য করিবার আনন্দ তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিতেছিল, কিন্তু গৃহে লতার পাণ্ডুর মুখ চক্ষে

কামানের অগ্নিশিখার দীপ্তি—তার প্রতিও একটা কর্ত্তব্য তো আছে—।

এইরূপ নানা অসংলগ্ন চিন্তায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল। এদিকে লতার হৃদয়ে তাহার নারীত্ব তাহাকে কশাঘাত করিতেছিল। কাপুরুষ তাহার স্বামী—না—না, তা হইতে পারে না। জগৎ সমক্ষে সে প্রচার করিবে যে তাহার স্বামী কাপুরুষ নয়—কিন্তু তিনি যে বড় দুর্ব্বল—হায় অভাগিনী নারী!

২

হেমেনের কার্য্যের দিন দিন ক্ষতি হইতে লাগিল। কার্য্যে সে আর পূর্ব্বের ন্যায় মনোযোগ দিতে পারে না; চারিদিকে খাঁকি-পোষাক-পরিহিত যুবক দৃষ্টিতে পড়ে, আর তাহার হৃদয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হয়। ছবি আর সে লেখে না, আর যাহাও করে তাহাতে সে সজীবতা ফুটিয়া উঠে না। তাহার সে সাধনা আর নাই। স্বামী স্ত্রীর সে প্রফুল্লতা যেন কেহ মায়া-যষ্টির প্রভাবে দূর করিয়া দিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় যেখানে সঙ্গীতের বন্যা বহিয়া যাইত, আজ সেখানে নিস্তব্ধতা তাহার নিরানন্দ গম্ভীর মূর্ত্তি লইয়া বিরাজ করিতেছে। বিবাহ যাহার পবিত্র বন্ধন স্মরণ করিতে হেমেনের মস্তক ভক্তিতে নত হইত, আজ তাহা তাহার নিকট একটা মায়া, একটা শৃঙ্খল বলিয়া বোধ হইতেছে, যাহা এতদিন তাহাকে সুখদান করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা দুঃখের আকর বলিয়া বোধ হইতেছে। হায় মানব!

*   *   *   *

বাস্তবিক একদিন পাগলামি তাহাকে পাইয়া বসিল। রাস্তায় যাইতে যাইতে একদিন সে হঠাৎ গিয়া এ্যাম্বুলেন্সে নাম লিখাইয়া আসিল। এই ব্যাপারটি এত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া গেল যে বোধ করি সে নিজেই ব্যাপারটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। পরে যখন সে রাস্তায় বাহির হইল তখন পূর্ব্বের সেই সজীবতা তাহার মুখে চোখে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। সৈনিকের নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে তাহার গৃহের ফটক পার হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার গর্ব্বোদ্ধত বক্ষ নত হইয়া পড়িল, তাহার সেই সজীবতা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

লতা একাকী বসিয়া, হাতে একটি সেলায়ের কাজ লইয়া গুন্ গুন্ করিয়া একটি বড় করুণ গান গাহিতেছিল, এমন সময় হেমেন তথায় উপস্থিত হইল।

লতা সেলাই রাখিয়া বলিয়া উঠিল "এত দেরী হ'ল? ওকি! তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

"না, কিছুই হয় নি লতা, খাবার হয়েছে?"

"হাঁ, এনে দিচ্ছি।"

ব্রাহ্মণ ঠাকুর খাবার দিয়া গেল। লতা কাছে বসিয়া খাওয়াইতে লাগিল, এটা ওটা সেটা জোর করিয়া পাতে

ফেলিয়া দিতে লাগিল, হেমেন বিনা আপত্তিতে খাইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার বিমর্ষভাব, তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহা যেন স্পষ্ট করিয়া লতার নিকট ধরাইয়া দিতেছিল। কিন্তু সে কথা চাপা দিয়া সে বলিয়া উঠিল "শুনেছ আমাদের হরি কাকার ছেলে এ্যাম্বুলেন্সে যাচ্ছে, আহা বেচারা জ্ঞানদার কি কষ্ট বল তো, এই সেদিন বিয়ে হ'ল। এ বড় অন্যায় স্ত্রী-পুত্র ফেলে চলে গেল। বিবাহিতের প্রথম কর্ত্তব্য তো স্ত্রী পুত্রের প্রতি।"

দুজনেই চুপ। কোন সাড়া শব্দ নাই। হেমেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "শুনেছ লতা আমিও এ্যাম্বুলেন্সে যোগ দিয়েছি।" কথাটা বলিতে বোধ করি সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল কারণ পরমুহূর্ত্তে তার মুখখানা মৃতের ন্যায় সাদা বলিয়া বোধ হইতেছিল। কথাটা শুনিয়া লতা নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় হেমেনের প্রতি তাকাইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল "তুমি—নাম—দিয়েছ।"

অপরাধীর ন্যায় হেমেন বলিল, "লতা ক্ষমা কর—আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, কিন্তু কি ক'রব, পারলুম না—" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ছিন্ন মুক্তাহারের ন্যায় গড়াইয়া পড়িল।

"ক্ষমা!—তোমাকে প্রিয়তম—তুমি কি বলছ! তুমি কি মনে কর আমার ইচ্ছা আমার খোকার বাপ কাপু—" আর সে বলিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু আনন্দ ও গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পরে প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার বুকের মধ্যে সে আশ্রয় লইল। হেমেন ধীরে ধীরে তাহার চুলের মধ্যে হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিল "তুমি না ব'লছিলে যে বিবাহিতের—" লতা চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল "আমি তো অনেক কথাই বলি, মুখ্যুর সব কথা কি ধরতে আছে। সত্যি প্রিয়তম, যদি তুমি যুদ্ধে যোগ না দিতে—সত্যি সেদিন সতীশবাবুর ভাইএর সামনে ঐ কথাগুলো বলে আমার এমন লজ্জা হচ্ছিল, তিনি কি ভাবলেন বল তো।"

"কি আর ভাবলেন, এখন চল, রাত ঢের হ'ল।" বলিয়া হেমেন তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া শয়নগৃহের প্রতি চলিল।

* * * * *

আপনাদের স্ত্রীরা কি বলেন?

দু ফোঁটা জল !

সন্ধ্যেবেলা। আফিস থেকে এসে তাস জোড়াটা নিয়ে কালকের ৪০০ ডাউনের কথা ভাবছি। কি করে আজ অরুণকে হারাব। কাল ভারি হারিয়েছে। হঠাৎ চেয়ে দেখি মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, সহজে যে ছাড়বে তা'তো গতিক দেখে মনে হ'ল না। হতাশভাবে ষ্ট্রাণ্ড-ম্যাকেঞ্জিন্‌খানা টেব্‌লে রেখে ব্রীজ প্রব্‌লেম্‌টার কথা ভাবছি, এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়ে হরেন আর সুবোধ এসে জুট্‌ল। ভাবলুম অরুণ এলে এক হাত বসে যাব, আজ কালকের শোধটা সুদ শুদ্ধ তুলতে হবে। কিন্তু অরুণের আসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বৃষ্টি ক্রমশঃ বাড়তে চ'লল, মজলিস্‌টা এই বাদলার দিনে তেমন জ'মল না ভেবে, আমরা সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হলুম। সুবোধ ভারি অস্থির, এটা ওটা নেড়ে অল্প সময়ের মধ্যে ঘরটার এমন চেহারা করলে যে তা' আর প্রকাশ করা যায় না। এই জন্যে আমার স্ত্রী এই বন্ধুটির নাম দিয়েছেন 'ঝোড়ো হাওয়া'।

সুবোধের এই নামটা ভারি পছন্দ, সে এই নামকরণের দরুণ আমার স্ত্রীর বুদ্ধির অনেক তারিফ্ করে। র‍্যাক্ থেকে একখানা *পত্র নিয়ে সে একটা চুরুট্ ধরালে, তারপর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রমথবাবুর 'একটি সাদা গল্প'টা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে, কাগজখানা টেবলে রেখে আমার দিকে চেয়ে বলে উঠ্‌ল "ওহে অতীন, এস আজ একটু তর্ক করি।" তার কথা শুনে আমি বল্লুম "কেন বল দেখি, আজ 'এ মহা ভাদর মাহ ভাদর' নাকি হে? তর্ক করে রাতটা কি এখানে কাটাবে, তোমার তর্ক একবার উঠলে তো আর থামবে না, সারারাত চ'লবে।"

"না হে দেখ এই গল্পটা প্রমথবাবুর লেখা উচিত হয় নি।"

"কেন বল দেখি? আমার তো গল্পটা বেশ ভাল লেগেছে।"

"কি বল ছাই, এটা গল্পের খাতিরে গল্প মোটেই প্রাকৃটিক্যাল নয়, ও রকম মেয়ে বিনা পণে নেবে এমন ছেলে আজকাল ঢের আছে। আর উনি বলেন কিনা যে ওর ঐ গুণগুলো তার বিরুদ্ধে দাঁড়াল—সেকালে ও মত চ'লত, লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা হয় যখনকার দিনে ধারণা ছিল।"

আমি "হু" বলে অন্যমনস্কভাবে আবার ট্রাও-ম্যাকেঞ্জিন্-

খানা ওল্টাতে লাগলুম, যদি সে থামে। তার ও রকম বেয়াড়া তর্ক শুনে শুনে আমাদের কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে, কাজেই ওতে আর আমাদের বড় তর্ক কর্ব্বার ইচ্ছে হয় না। হরেন বাবু এতক্ষণ বসে বসে একমনে চুরুট্ টানছিলেন, শেষটান দিয়ে এ্যাসট্রেতে চুরুট্টি রেখে বল্লেন "আচ্ছা সুবোধ, তর্ক তো খুব ক'রছ, কিন্তু আমি যদি তোমাকে ঠিক্ এই রকম একটি মেয়ে দেখাতে পারি, তবে তুমি কি তাকে বিনা পণে বিয়ে কর্ত্তে রাজী আছ? লেখাপড়া তো শেষ করেছ, আর তো কোন আপত্তি নেই?"

কথাটা হঠাৎ শুনে সুবোধ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, তবে সামলে নিয়ে বলে উঠ্‌ল "নিশ্চয়ই আমার ধারণা হয় না যে এ রকম মেয়ে অবিবাহিত থাকতে পারে—আর আমি না করি আরও তো ঢের ছেলে রয়েছে।"

"ঐ তো গোল বাধালে—তুমি বিয়ে কর্ব্বে কিনা তাই বল?"

"আচ্ছা আপনি ব্যাপারটা সব খুলে বলুন, তারপর আমি আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি।" "ঐ তো তোমাদের—আচ্ছা বলছি তবে শোন—"

হরেন বাবুর কথা।

আমরা এখন কাঁশারি-পাড়ায় থাকি, এ বাড়ীটা তখন কেনা হয় নি। জ্যাঠামশায় তাঁর অংশ বেচে কাশী চলে গিয়েছেন, আমরাই তাঁর অংশটা রেখেছি। বাড়ীটা ভাড়া দেওয়া হবে এই রকম বাবা স্থির করেছেন। মাঝখানের দরজাটা সারাদিন খোলা থাকে, ঐ বাড়ীতেই আমাদের আড্ডা বসে, ছোট বোনদের খেলাঘর বসে। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি, মাঝের দরজা বন্ধ। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে, স্কুল খুলে এল, দু'টো দিন পুরোদমে আড্ডা দিয়ে নিই, পরে পড়া তো সারা বছর রয়েছে; এই রকম নানা কথা ভাবছি। মা এসে বল্লেন "কিরে মুখ ধুলি না, বসে বসে কি ভাবছিস—পড়াশুনো কিছু করিস নি তাই ভাবনা হয়েছে—না?"

আমি সপ্রতিভভাবে উত্তর দিলুম "না মা সেজন্য ভাবছি না, তবে কথাটা হচ্ছে ও বাড়ীর দরজাটা আজ হঠাৎ বন্ধ হ'ল কেন?"

"ওঃ শুনিস্‌নি, ও বাড়ীতে যে ভাড়াটে এসেছে—ঐ কি বলে কোথাকার এক মস্ত জমীদার—কে জানে বাপু কি নামটা—মনেও থাকে না ছাই—।" বাধা দিয়ে বলে উঠলুম "থাকগে তোমার নাম—বলছি কি ছেলেপুলে ওদের কেউ আছে?"

"হ্যাঁ উনি বলছিলেন দু'টি ছেলে বার তের বছরের আর একটি মেয়ে বছর ছয়েকের। দিব্যি মেয়েটি লক্ষ্মী পিরতিমে —ইচ্ছে করে ঐ রকম—।"

মার ইচ্ছেয় বাধা দিয়ে বল্লুম "থাক্‌গে মা তোমার ইচ্ছে, ছেলে দু'টি কি করে?" "ইস্কুলে পড়ে, তাদের পড়াশুনোর দরুণই তো এখানে ওদের আসা—কর্ত্তা তো সব সময় এখানে থাকতে পার্ব্বেন না; ছেলেরা থাকবে, চাকর বামুন সরকার থাকবে। দুপুরবেলায় গিয়ে গিন্নির সঙ্গে আলাপ করে আসব।"

মার কাছ থেকে সব শুনে পড়বার ঘরে গিয়ে পড়তে বসলুম। খানিক পরে দেখি ছেলেমেয়ের গোলমালে বাড়ীখানা গম্ গম্ ক'রছে। ছেলেরা মাঠে ছুটোছুটি ক'রছে, মেয়েটি পুণ্যিপুকুর ব্রতের জন্যে বোধ হয় দুর্ব্বো তুলছে। তরুণ অরুণের আভা পড়ে মুখখানির কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে। ও বাড়ীর মাঠের দিকের জান্‌লাটার কাছেই আমার পড়ার আড্ডা ছিল, কাজেই আমি তাদের নজরে পড়ে গেলুম। বড় ছেলেটি জান্‌লার কাছে এসে আমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে আরম্ভ করে দিল। কি পড়ি, কোথায় পড়ি, নানা রকম প্রশ্ন। জানলুম সেও আমাদের ক্লাসেই ভর্ত্তি হবে, বেশ একসঙ্গে পড়া যাবে শুনে মনটা ভারি

খুসি হয়ে উঠল। দুপুরবেলায় ও বাড়ীতে যাবার জন্তে বল্লে, আমিও রাজি হলুম। এই রকম করে আমাদের সম্বন্ধটা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ভাড়াটে হিসেব আর তাদের সঙ্গে রইল না, অমরেশবাবু আমাদের জ্যাঠামশায়ের স্থান অধিকার কল্লেন। এই রকমে দু তিন বছর কেটে গেল, অমরেশবাবুর দু'টি ছেলেই পরীক্ষা দিলে, আমিও দিলুম। পরীক্ষা দিয়ে তারা বাড়ী যাবার যোগাড় কর্তে লাগল। দেশে যাবার আনন্দে তাদের মন ভরে উঠেছিল, সে কি আনন্দ! প্রকৃতির সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ আলাপের জন্তে তাদের প্রাণ না জানি কি রকম ব্যগ্রই হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক বলতে কি তাদের ওপর আমার ভারি রাগ হয়েছিল। যাক্ শোন, তারপর পাসের খবর বেরুল, অমরেশবাবুর দু'টি ছেলেই ফেল হয়েছে। তাদের মনে কি রকম হয়েছিল বলতে পারি না, কিন্তু আমার বলতে কি, ভারি দুঃখু হয়েছিল। এই শুক্নো চোখ্ থেকেও জল বেরিয়েছিল। তাদের কোন চিঠি-পত্তর আর পাই নি, স্কুল, কলেজ খুলল; আমি কলেজে ভর্ত্তি হলুম। ওদের কোন চিঠি-পত্তর লিখতে সাহস কর্লুম না, কি জানি যদি তাদের মনে আঘাত লাগে, যদি ভাবে নিজে পাস হয়েছে কিনা। এক মাস কেটে গেল, তারা এল না, হঠাৎ বাবার কাছে একখানা ইন্‌সিওর করা চিঠি এল। তা'তে অমরেশবাবু

বাকী ভাড়া পাঠিয়েছেন আর লিখেছেন যে নানা দৈব-দুর্বিপাকে তাঁদের আর ভবানীপুরে আসা হ'ল না। দু' চারটে যে জিনিস-পত্তর আছে তা আমাদের বাড়ীতে রাখতে, এই রকম নানা কথায় চিঠিখানা ভর্ত্তি। কিন্তু আদত কথাটি যে কি তা ঠিক্ বোঝা গেল না। যাই হোক্, তারপর থেকে তাঁদের আর কোন খোঁজখবর পাই নি। এদিকে আমার মাথার ওপর দিয়ে অনেক বিপদ্ আপদ্ বয়ে গেল, তা তো জানই। শেষে যে বার আমি এ্যাটর্ণি হয়ে বেরুই, সেই সময় সিমুলতলা থেকে তাঁদের এক চিঠি পেলুম; অনেক কথা লিখেছে, কিন্তু আমি যে কথাটি জানবার জন্যে ব্যস্ত সে কথাটির আভাস সারা চিঠিখানাতে নেই। কেবল লেখা আছে ইনা অমরেশবাবুর মেয়ে) ভাল আছে। চিঠিতে ঠিকানা দেয় নি, কাজেই উত্তর দিতে পারলুম না, তবে বুঝলুম ভুলটা ইচ্ছাকৃত।

তারপর সেদিন এই দশ পনের দিন আগেকার কথা, আফিস্ থেকে ফেরবার মুখে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হয়ে যাবার জন্যে কোচম্যানকে মুখ বাড়িয়ে বলছি, এমন সময় "হরেন্ বাবু না?"—বলে কে ডাকলে। গাড়ী থামাতে বলে চেয়ে দেখি একজন রোগা ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন, লোকটিকে কখন চিনি বলে তো বুঝতে পারলুম না। কাছে এসে যখন আমায় ডাকলে তখন গলার স্বরে ধরলুম অমরেশবাবুর বড়

ছেলে শরৎ; তাড়াতাড়ি হাত ধরে গাড়ীতে তুলে নিলুম। তবে তাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হ'ল না, তার পোষাক পরিচ্ছদ সে বিষয়ে সাক্ষী দিচ্ছিল। মনে মনে ভাবলুম, হ্যাঁ 'Adversity is a good school' কথাটা খুব খাঁটি। সেই শরৎ যে পাম্প-সু, দিশী ধুতী ছাড়া প'রত না, গাড়ী চড়ে স্কুলে যেত, দু'জন মাষ্টারে পড়াত, তার আজ এই অবস্থা। জিজ্ঞেস্ কল্লুম, "তারপর শরৎ, আজকাল কি কচ্ছ ?"

"এই—" বলে আর সে ব'লতে পারলে না। একটা চাপা কান্নার সুর বোধ হয় তার স্বর বন্ধ করে দিয়েছিল। কথাটা বলে আমিও অপ্রস্তুতে পড়েছিলুম, তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস্ কল্লুম "জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা তোমরা সব ভাল আছ ?"

"হ্যাঁ এক রকম আছেন, চল না এই কাছেই তো আমরা থাকি, বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবে।"

"তোমরা এখানে থাক !—কতদিন এসেছ, আমাকে তো একটা খবরও দাও নি !" কথাগুলো বোধ হয় একটু রেগেই বলেছিলুম।

শরৎ একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে "এই বেশী দিন আসি নি—তোমার ওখানে যাব যাব কচ্ছিলুন পথে আজ দেখা হয়ে গেল।"

"যাক্ গাড়ী কোথায় দাঁড়াবে দেখিয়ে দিও, ওসব কথা জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে'খন।"

গাড়ী একটা সরু গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াল, অমন বিশ্রী পল্লী যে ক'ল্‌কাতার মধ্যে থাক্‌তে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনা, দুর্গন্ধ। অনেক কষ্টে রুমাল নাকে দিয়ে একটা একতলা বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ান গেল —ভাঙ্গা ঝর্‌ঝরে বাড়ী। শরৎ কড়া নাড়তে লাগল। একটি লম্বা স্ত্রীলোক—অনেকটা তোমাদের গ্রীক্ মডেলের মত—এসে দরজা খুলে দিয়ে আমাকে দেখে ধাঁ করে চলে গেলেন। কে এ! ঠিক্ বুঝতে না পারলেও ভাবলুম শরৎএর স্ত্রী বোধ হয়। ঘরে ঢুকলুম—দৈন্যের পরিচায়ক আসবাব-পত্তর, তবে দু একটা এখনও পূর্ব্বের গৌরব মাথা তুলে জানাচ্ছে। আমার বুকের ওপর কে যেন একটা গুরুভার পাথর চাপিয়ে দিলে। অমরেশবাবুকে, জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করে তক্তোপোষের ওপর বসলুম। কি প্রশান্ত সে মূর্ত্তি! কি নির্ব্বিকার সে চিত্ত! সোণা যে পুড়ে খাঁটি হয় এটা তাঁকে দেখে বিশ্বাস না করে থাকা যায় না। ধীর, শান্তস্বরে তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা—কি করে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে, মামলা মোকর্দ্দমায় এক এক করে তাঁর সমস্ত জমিদারি—বাড়ী, গহনা-পত্তর, গাড়ী-ঘোড়া সব গেল—রৈল দুই

ছেলে, কর্ত্তা গিন্নী একমাত্র মেয়ে আর পুরাণ চাকর রামচরণ—সব বল্লেন। ওঃ, সে কি বিষাদময় কাহিনী। তিনি যখন থামলেন তখন মনে হল এ কি গল্প—না সত্য—পরে সোজা হয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা কল্লুম, "ইনা কোথায়? তাকে যে দেখছি না?"

"মা তোর দাদা এসেছে, নমস্কার করে যা।"

চেয়ে দেখি একটা শ্বেতপাথরে খোদা মূর্ত্তি এগিয়ে আসছে। এ কে! এই সেই ইনা! কে যেন আমাকে সজোরে নাড়া দিয়ে সচেতন করে দিলে। ধীরে ধীরে সে এসে আমার পায়ে মাথা ঠেকালে, সিঁথেয় নজর পড়ায় চম্‌কে উঠলুম—সিঁথেয় সিঁদুর নেই কেন? তবে কি!—না—না সে কথা ভাবতে পারি না।

অমরেশবাবু ইনাকে বসতে বল্লেন, সে তাঁর কাছে গিয়ে ব'সল—যেন তপস্যানিরতা উমা মূর্ত্তি—ভাল করে তার দিকে চেয়ে দেখলুম, মুখে যদিও একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা শ্রী যেন ফুটে বেরুচ্ছে, এখনও মুখে চোখে যেন সরলতা মাখান। তা'তে সৌন্দর্য্যের যে কোন অভাব নেই তা আমি তোমায় বলছি।

অমরেশবাবু বল্লেন "একটা ছেলে দেখে দাও না বাবা, তোমাদের আলাপ সালাপ তো ঢের আছে।"

"বাবা—" বলে ইনা আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল। কি কাতরতা, কি আত্মমর্য্যাদা সে স্বরে। এইবার ব্যাপারটা জলের মতন সোজা হয়ে গেল। এখন বুঝলুম ইনাই দরজা খুলে দিয়েছিল।

অমরেশবাবু বল্লেন "পাগলি মেয়ে আমার এই অবস্থা দেখে বিয়ে কর্ত্তে রাজী নয়,—বলে কি জান হরেন? বলে 'লেখাপড়া যখন শিখিয়েছেন তখন আমারও তো একটা মত আছে। আর শাস্ত্রে এমন কিছু বিধি নেই যাতে করে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে হবে বরং তার উল্টো বিধিই আছে, আর যারা ভাবী আত্মীয়ের রক্ত শোষণের জন্যে এত উৎসুক তাদের ওপর তো বাবা আমার ভক্তি শ্রদ্ধা মোটেই হবে না, আপনি জেনে শুনে কি ক'রে আমার এই পাপে প্রশ্রয় দেবেন।' মোটের ওপর আমরা তো কোন মতেই রাজী কর্ত্তে পারি নি, তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না বাবা, যদি কোন ছেলে বিনা পণে নেয়। তবে এটা আমরা ব'লতে পারি যে তারা জিতবে বই ঠ'কবে না। মা আমার লক্ষ্মী সরস্বতী একাধারে—লেখা-পড়া, কাজকর্ম্মে অন্য বড় ঘরের মেয়েদের কাছে যে মা আমার বেমানান হবে না, তা বাপ হয়ে বলা বেশীর ভাগ।" অমরেশ-বাবু থামলেন। সেদিনকার তো এই ঘটনা। গোড়া থেকেই তোমার কথা আমার মনে হয়েছিল, ব'লব ব'লব ভাবছিলুম

তা আজ তুমিই কথা তুললে ; আর এটুকু তোমাকে আমি বলতে পারি যে সে তোমার অযোগ্যা হবে না। আর বিয়ে যার জন্যে অর্থাৎ সুখস্বচ্ছন্দ তা তুমি যে ভোগ ক'রবে তা আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি। এর একবর্ণও যে অতিরঞ্জিত নয় তা তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর। এখন রাজী ? কেমন ?

হরেন বাবু চুপ ক'রলেন। সুবোধের চোখের কোণ থেকে দু ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করে টেব্‌লের ওপর প'ড়ল, মুখে রুমালখানা দিয়ে সে সেটা ঢাকা দিলে। ভাবলুম এটা তার ভাবী পত্নীর অক্ষয় কবচ—আনন্দাশ্রু।

*　　　*　　　*　　　*

দিন দুই পরের ঘটনা। সুবোধের ওখানে গিয়ে দেখলুম, দিব্যি নিশ্চিন্দিমনে একখানা ইজি-চেয়ারে পড়ে সে একখানা ইংরিজি নভেল প'ড়ছে। দেখে তো আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। আমি কোথায় ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি যে আজ মেয়ে দেখতে যাব, সব ঠিক্ ঠাক্, আর উনি এখনও পড়ে পড়ে নভেল পড়ছেন ! একটু রেগে বল্লুম "কি হে ? বেশ লোক তো ? খুব যা'হোক।"

"কেন কি হয়েছে হরেনদা ? আপনি রাগ কর্চ্ছেন কেন ?"

"মেয়ে দেখতে যেতে হবে না ?"

"ওঃ, আমার মনেই ছিল না। নভেলটার এমন crisisএ পৌঁছেছিলুম যে একেবারে খেয়ালই ছিল না। এমন realistic ঘটনাটা—মেয়েটির জন্যে ভারি দুঃখু হচ্ছিল।"

"ও মিথ্যে দুঃখু রেখে, এখন সত্যিকার দুঃখু দূর কর্বার উপায় করদিকিনি। যাও কাপড় পরে এস।" বলে এক-খানা সোফায় বসে পড়লুম।

"আমি আর কি দেখব। আপনি তো দেখেছেন।"

"ও সব ন্যাকামি রাখ, এখন চলদিকিনি।"

"হ্যাঁ—না—একটু দরকার ছিল প্রভৃতি নানারকম ওজর আপত্তি ক'রেও খালাস না পেয়ে সে যখন কাপড়-চোপড় পরে এসেন্সের গন্ধে ঘর মাতিয়ে বেরিয়ে এল তখন আমি একটা নিশ্বেস ফেলে বাঁচলুম। সেদিন যদি কথামত না যেতুম, তা' হ'লে অমরেশবাবুর মনে কি রকম লা'গত তা, ভাবতেই আমার দম বন্ধ হবার যোগাড় হচ্ছিল। যাক্, তারপর যখন তাদের বাড়ী পৌঁছুলুম তখন রোদটা পড়ে গেলেও আলোটা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, কেন না তাঁদের সেই গলির মধ্যের বাড়ীর রোয়াকেও বেশ একটা টোয়াইলাইটের (twilight) ভাব দেখা যাচ্ছিল। অমরেশবাবু একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কোথায় বসতে দেবেন। আমি একখানা মাদুর টেনে নিয়ে রোয়াকেই সুবোধকে

বসিয়ে দিলুম। তারপর অমরেশবাবু ইনাকে পান দিয়ে যেতে বল্লেন। "তুমি তো বাবা এখন পান খাও না" বলে একটি রেকাবে করে গুটি চারেক পান নিয়ে সে এগিয়ে এল। মুখ তুলে চাইতেই সুবোধের ওপর নজর পড়ায় সে একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে, পরে আস্তে আস্তে রেকাবীটা মাদুরের ওপর রাখতেই জ্যাঠামশায় বল্লেন "মা নমস্কার কর ত।" বেশ সহজভাবে ধীরে ধীরে সে আমাদের তিনজনকে নমস্কার করলে। পরণে তার একখানি মিলের রেলিঙ-পাড় কাপড়। চুলগুলো অমনি জড়িয়ে বাঁধা, মুখের ওপর দু'চারটে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ এসে পড়েছে। তার রঙের জলুস্ বাড়াবার জন্যে তোমায় পিয়ার্স সোপও একখানা খরচ করা হয় নি বা রুজ-পাউডারের শ্রাদ্ধ করা হয় নি। তার সরলতা ও তার মধ্যের নারীত্বই সে মুখের জলুস্ বেশ ফুটিয়ে তুলেছিল। নমস্কার ক'রে যখন সে দরজায় হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আমি তো তখন সুবোধের অবস্থা দেখে মনে মনে 'পলথুম্যানের' 'তন্ময়' ছবিখানার কথা ভাবছিলুম, আর মনে মনে ভগবানের কাছে এদের মিলন প্রার্থনা করছিলুম। অমরেশবাবুর কথায় সুবোধের চমক্ ভাঙ্গল। তিনি বল্লেন "তা' হ'লে ও যাক্ বাবা? যাও মা ঘরে যাও" ব'লে তিনি ইনার দিকে চাইলেন। সাড়ীর আঁচলটা

আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে সে ঘরের মধ্যে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। সুবোধের দিকে চেয়ে দেখলুম তখনও তার মুখের ওপর থেকে সে হিপ্‌নটিক্ ভাবটা কাটে নি। বাড়ী আস্‌তে আস্‌তে জিজ্ঞাসা কল্লুম "কি হে? কেমন দেখলে?"

"মন্দ কি, বেশ মেয়ে। তবে এটা সত্যি; এতটা যে ভাল তা' কিন্তু আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নি।" পথে আর কোন কথাই হ'ল না। সুবোধকে বড়ই চিন্তিত বলে মনে হ'ল। ভাবলুম ইনাদের দুঃখুর কথাই ভাবছে, তবুও ঠাট্টা করবার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না। ব'লে উঠলুম "কি হে ভায়া, এখনই এত?" "কি যে বলেন হরেনদা" বলে সে চুপ ক'রলে। সুবোধকে ওদের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে বাড়ী এলুম। তারপর দিন জ্যাঠামশায়কে খবর দেবার কথা। বিকেলে সুবোধদের ওখানে গেলুম। সুবোধ একখানা বাঙ্গলা কবিতার বই পড়ছিল। আমাকে দেখে উঠে ব'সল। সুবোধের হাতে বাঙ্গলা বই, তাও আবার কবিতার বই দেখে বল্লুম "কি হে বাঙ্গলা কবিতার ওপর যে আজকাল বড় টান্ দেখছি, ব্যাপার কি?"

সে শুধু হেসে বল্লে "বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা", "তবু যা' হোক্, তবে এক দিনেই যে এমনটা হবে তা ভাই আমি আশা করি নি।" বলে হো হো করে হেসে

উঠলুম। হাসিটা পোড়ো-বাড়ীর মধ্যের আওয়াজের মতন বেজায় বেতালা ও বেসুরো শোনাল। তারপর কাজের কথা পাড়লুম, কিন্তু আশামত কোন উত্তর পেলুম না। কাকা-বাবুকে জিজ্ঞেস্ করুন—তিনি যা বলবেন ইত্যাদি। ভারি রাগ হ'ল। গম্ভীর হয়ে বল্লুম "লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁর কোনও অমত নেই, এখন তোমার মত হলেই হয়। ওঁরা এই সুমুখের মাসেই বে দিতে চান?"

"এত তাড়াতাড়ি—দুদিন—বাদে আপনাকে বল্লে হবে না?"

"তোমাদের তাড়াতাড়ি মনে হ'তে পারে, কিন্তু মেয়ের বাপের ধীরে সুস্থে দেবার অবস্থা অনেক দিন পার হ'য়ে গেছে। যা ভাল বোঝ, খবরটা আমাকে পাঠিও, তাঁরা হাঁ ক'রে বসে আছেন।" বলে রাগে গস্ গস্ কর্ত্তে কর্ত্তে সটান্ বাড়ী চ'লে এলুম। জ্যাঠামশায়কে গিয়ে খবরটা দিয়ে এলুম—অবশ্য একটু ভদ্রভাবে। তারপর দিন আবার সুবোধদের ওখানে গেলুম—সেই এক কথা, হাঁ—না—জিজ্ঞেস্ করুন ইত্যাদি। তারপর অনেক পেড়াপিড়ি কর্ব্বার পর—মরিয়া হয়ে যখন তাকে চেপে ধরলুম, তখন সে যে উত্তর দিলে সেটা যে পরিমাণে আমাকে আঘাত ক'রেছিল তা' যে তোমার তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতের চেয়ে ঢের বেশী

এবং জার্ম্মান হাউইট্‌জার গোলার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয় তা' আমি এখন হলপ্ ক'রে ব'লতে পারি। তার সার মর্ম্ম হ'ল গিয়ে সেই প্রমথবাবুরই কথা। প্রথমতঃ, মেয়ের বয়স—তবে তার শিক্ষা সম্বন্ধে সুবোধের কোন আপত্তি নেই; যদিও মেয়েদের ঘোর আপত্তি—কারণ নাকি তাঁদের ধারণা, লেখাপড়া শিখলে নিজের স্বত্ব সম্বন্ধে মেয়েরা নাকি খুব সতর্ক হ'য়ে উঠে; আর উল্ বুনতে, নভেল পড়তে খুব দক্ষ হতে দেখা যায়। আমার তখনকার মনের অবস্থাটা ঠিক্ কি রকম ছিল তা মনে না থাক্‌লেও এটা ঠিক যে সেটা সহজ অবস্থায় ছিল না; কারণ সুবোধকে কি ব'লেছিলুম, তার এক বর্ণও মনে নেই, তবে এটুকু বেশ মনে আছে যে তার সেই গোড়ার কথাটি নিয়েই তাকে ঘা দিয়েছিলুম অর্থাৎ প্রমথবাবুর গল্পটিই প্র্যাক্‌টিক্যাল আর তার মতন বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাস্থল যুবকদের কথাটাই 'থিওরেটিক্যাল' বা পুঁথিগত। আর ও রকম মেয়ের বিয়ে দোজবরে দারোগা বা তেজবরে বুড়ো জমিদার ছাড়া হওয়াও অসম্ভব।"

অপ্রকাশ

রথের ছুটি। দুপুরবেলা বন্ধুদের শুভাগমনে দিনটা বেশ কাটিয়ে দেওয়া গেল। তিনটে চারটের সময় এক এক করে সকলে চলে যাবার পর বাড়ীর ভেতর যাবার জন্যে উঠলুম। প্রথমেই চৌকাটে হোঁচট খেয়ে বাধা পেলুম, দুএর নম্বর এক হাঁচি! ভাবী দুর্ভাবনায় মনটা টন্ টন্ ক'রে উঠল। দুর্গা দুর্গা বলে অন্দরমহলে ঢুকলুম। ঘরে ঢুকতেই দেখি গৃহিণী খোকাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন—তাঁর মুখাকাশে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ। এ রকম ব্যাপার প্রায়ই হয়, কাজেই এই ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু সেদিন মান ভাঙ্গবার উপক্রম করতেই আমার কপালে একেবারে ঝড় উঠল। কোনমতেই সে ঝড় থামে না, ক্রমশঃই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতে লাগল। এখানে ব্যাপারটা আপনাদের খুলে বলি। রথে পুরী যাবার জন্যে গৃহিণী বায়না লন। কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি হবে এইরূপ নানা ঝঞ্ঝাটের কথা তুলে—পরে আর এক সময় নিয়ে যাব বলে সেদিন রেহাই পাই। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, আজ খোকনবাবু সকালে জগুয়ার সঙ্গে বাজারে গিয়ে এক মাটির রথ ও ভেঁপু নিয়ে বাড়ী ফিরতেই সেই ভেঁপুর স্বর

শুনে গৃহিণীর আমার পূর্ব্ব শোক আবার উথলে উঠে। ব্যাপারটা অন্যদিনের মত সহজে মেটে নি। সুতরাং আমার কপালে অনাহার না হলেও সেদিনর মত অর্দ্ধাহার! অর্থাৎ এক পেয়ালা চা খেয়েই বাড়ী থেকে বেরুতে হ'ল। কোথায় আর যাব—আমাদের সকলের মিলন-স্থল ছিল সুখেন্দুদের বাড়ী। সেইখানেই বেড়াতে বেড়াতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি সেখানে তখন পুরোদস্তুর মজলিস্ জমেছে। ক্রমশঃ চায়ের সরঞ্জাম এক এক করে দেখা দিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুপত্নীর হাতের তৈরী গরম চপ্ প্রভৃতি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে মজলিস্‌টা এমন গরম করে তুল্লে যে কোথা দিয়ে যে সূর্য্যিঠাকুর ডুবে গিয়েছে তা টেরও পেতুম না যদি না একটা বহুকণ্ঠের মিশ্রিত কান্নার রোল এসে আমাদের সেই হাসি ঠাট্টার মজলিসে বেখাপ্পা রকম সুরে বেজে উঠত। কান্না শুনে আমি প্রথমে বলে উঠলুম "মরাকান্না কোত্থেকে উঠল হে?" সুখেন্দু বললে "অপ্রকাশকে মনে পড়ে? সেই যে ফিট্ ফিটে ছোকরাটি আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ত? এ সেই হতভাগ্যেরই মৃত্যু-ক্রন্দন। আহা বেচারা!" তারপর একটু থেমে বল্লে "তুমি কি ওদের কোন খবরই জান না?" "কই না, পড়াশুনো ছাড়বার পর আর তো ওদের কোন খোঁজ-খবর রাখি নি।"

"ওঃ! তবে শোন—ঐ যে মোড়ের ফটকওয়ালা উঁচু

পাঁচিল-ঘেরা লাল-রঙের বাড়ীখানা দেখছ ঐ খানা হ'ল অপ্রকাশদের বাড়ী। ছেলেবেলা থেকে আমরা ঐ বাড়ী-খানার দিকে কেন জানিনা ভয়ে ভয়ে তাকাতুম—যেন এটা একটা দৈত্যপুরী। জান্‌লা দরজাগুলো প্রায়ই দিনের বেলায় বন্ধ থাকত—লোকজন বাড়ীটায় আছে বলে জানা যেত—সে কেবল ঐ পাঁড়ে দরোয়ান আর ঝি চাকরগুলো দেখে; তবে তারাও সাধারণ ঝি চাকরদের মতন বড় একটা চেঁচামিঁচি করতো না—কলের মতন কাজ করে যেত। তারা যে এখানকার ঝি চাকর নয় তা বোঝা যেত, কেননা তারা বাড়ী ছেড়ে কোন জানা শুনো লোকের কাছে যেত না—তাদের পরিচিত লোকজন নিশ্চয়ই এ সহরে কেউ ছিল না। বড় হয়ে শুনলুম ও বাড়ীটা ভৈরব রায়ের—নামের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তা তাঁর রুদ্ধ কয়েদখানার মত বাড়ী ও বোবা ঝি চাকরই প্রমাণ। আমাদের দেশে যেমন ছেলে ঘুম-পাড়ানোর সময় "বর্গী এল দেশে" ব'লে ভয় দেখায়, পূর্ব্ববঙ্গে নাকি ভৈরব রায়ের নামেও ছেলেপিলে সেই রকম ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। এটা অবশ্য একটু অতিরঞ্জিত হলেও ভৈরব রায়ের নামে যে তাঁর প্রজারা ও বাড়ীর সকলে তটস্থ হয়ে থাকতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। এমন যে ভৈরব রায় তারই ছেলে ছিল আমাদের অপ্রকাশ।

অমন শান্ত নরম প্রকৃতি—আমি তো এ পর্য্যন্ত একটীও দেখলুম না। বেচারার ঐ নরম প্রকৃতিই কাল হয়েছিল—এর জন্য তাকে স্কুলে কত হাসিঠাট্টা না সহ্য করতে হয়েছে, আবার বাড়ীতেও ঐ জন্যেই বাপের কাছে সে কুপুত্তুর খ্যাতি পেয়েছিল। লোকে বলত দৈত্যঘরে ও প্রহ্লাদ এয়েছে।

তারপরে সে ছিল মায়ের একমাত্র সন্তান। উপরি উপরি তিনটি সন্তান মারা যাবার পর অনেক দেবদেবীর মানত করে ঐ কার্ত্তিকের মতন ছেলেটিকে বুভুক্ষু মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাবার জন্যই বুঝি ভগবান পাঠিয়েছিলেন। যাক্, তারপর ছেলে যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল মা ততই তাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন—কি একটা ভবিষ্যৎ ভেবে তার স্নেহময়ী মাতা সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতেন। সে ভয়ের অবশ্য কারণও ছিল। কারণ, ভৈরব রায়ের প্রকৃতি—সেই সাধ্বী যতটা জানতেন ততটা বোধ হয় আর কারো জানবার অবকাশ হয় নি! কিন্তু বুকের মধ্যে লুকিয়ে তো ছেলের বয়স চেপে রাখা যায় না। তিনি যতই অপ্রকাশকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলেন ততই সে যেন নিজেকে প্রকাশিত করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠছিল। সুতরাং ভৈরব রায় ছেলেকে বারমহলে এনে মাষ্টার ও চাকরের জিম্মায় রেখে

দিলেন, কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুণ দু'টি হৃদয় ভেতরে গুমরে গুমরে শুকিয়ে পড়তে লাগল। ভৈরব রায় আর যাই হোন, এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁর ছিল, তাই তিনি অপ্রকাশকে মায়ের কাছে এসে ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। মা হারা-নিধিকে বুকে পেয়ে বুকের মধ্যে চেপে রেখে একটা শঙ্কিত আনন্দে বিনিদ্র হয়ে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। অপ্রকাশের কাছে শুনেছি সে যখন পড়তে যেত মা তখন তার ঠিক্ বৎসহারা গাভীর মতন ছুটে বেড়াতেন। সারা দুপুরটা কেমন যেন একটা বেদনার ভাব তাঁর মুখে ফুটে থাকত—ছেলেও এই দৈনন্দিন অনুভব-নির্যাতনের হাত এড়াতে পারে নি, সেও ইস্কুলে সমস্তক্ষণ মা'র এই মলিন মূর্ত্তিখানি কল্পনায় চোখের সামনে দেখত—এমন কি তোমরা জান না যে সে এ পর্য্যন্ত বিয়ে করে নি, পাছে মার কাছ থেকে সে দূরে গিয়ে পড়ে—আর একজন এসে পাছে তার স্নেহে ভাগ বসায়—এই ভয়ে। তোমরা শুনে হয়তো আশ্চর্য্য হবে যে এই বিয়ের কথা নিয়ে ভৈরব রায়ের মতন বাপের সঙ্গেও তার একটু বেশ মনান্তর হয়ে গিয়েছিল। মা অনেকদিন থেকে পিতাপুত্রের এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু কোন কথাই বলে উঠতে পারছিলেন না, পাছে তাঁর বলার দরুণই কোন একটা ব্যাপার শীঘ্র ঘটে যায়। তারপর আমাদের য়ুনিভার্সিটির পড়া শেষ করে সে যখন

জমিদারী সেরেস্তার কাজে মন দিলে তখন বাপ-মা দু'জনেই খুসি হলেন।

মা এই অবকাশে ছেলের বিয়ের কথা পাড়তে গিয়ে স্বামীর মুখ দেখে থেমে গেলেন। কথাটা সেই থেকে চাপা পড়েই গেল। মা এই বয়স্ক ছেলেটিকে নিয়ে তাঁর পুত্রকন্যার সাধ মিটাতেন, কারণ সেই ছিল তাঁর সব। সন্ধ্যেবেলায় ছেলেতে মায়েতে ছাদে বসে কত রকমের সুখ-দুঃখের আলোচনা হ'ত। ভৈরব রায় মাঝে মাঝে তার মধ্যে এসে পড়তেন এবং বোধ হত একটু বিরক্তও হতেন। তবে মা ও ছেলের আলোচনা বাপের সুমুখে বেশ স্ফূর্তি পেত না, সুতরাং সেটা কলের মতনই ভৈরব রায়ের আগমনে থেমে যেত। ছেলেরও সঙ্গী, সাথী বন্ধু সবই ছিল ঐ মা। আর এই ছিল তাঁদের জীবনের দৈনন্দিন কাজ। কিন্তু তাঁদের এই একটানা জীবনের মাঝখানে হঠাৎ শনির দৃষ্টি পড়ল। কি একটা কথা নিয়ে পিতা-পুত্রে একদিন একটু বচসা হয়ে গেল। মা তো পিতা-পুত্রের মুখ দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। ঠাকুর দেবতার চরণে অনেক মাথা খুঁড়লেন, অনেক মানত করলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হল না।

তার পরদিন বচসা হয়ে সেটা এতদূর গড়াল যে ভৈরব রায় তাঁর একমাত্র পুত্রকে বাড়ী থেকে জন্মশোধ বিদায়

দিলেন। অভিমানী পুত্রও মায়ের কথাটা একবার না ভেবে একটা বিশ্রী দিব্যি করে সেই যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, তারপর আর তার কোন খোঁজ-খবরই পাওয়া গেল না। তবে তার মৃত্যু-ক্রন্দন কি করে তাদের বাড়ীতে উঠল, আর তার হয়ে এত ক্রন্দন কে করলে যদি বল তবে শোন আমি সেই কথাটাই বলছি।

অপ্রকাশ যে দিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় সে দিন ছিল তার জন্মতিথির উৎসব। মা ওদিকে সমস্ত আয়োজন করে ছেলের মঙ্গল-কামনায় বসে আছেন, ছেলে কি একটা দরকারে বাইরে এসে বাপের সঙ্গে বচসা করে সেই যে নূতন কাপড় পরেই চলে গেল আর ফিরল না। মা যখন এই খবরটা ঝি চাকরদের মুখে শুনলেন তখনই শোকে অসাড়-অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ঝি চাকরেরা মুখে জলটল দিয়ে যখন তাঁর জ্ঞান সঞ্চার করলে তখন তিনি একবার চারদিক চেয়ে নিজেকে বোধ করি বেশ শক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—তখন তাঁর মুখে চোখে কোন ভাবেরই লক্ষণ ছিল না, কেবল ভেতরে প্রাণ আছে সেটা বোঝা গেল—তাঁর চলা ফেরার দরুণ। ভৈরব রায় সবই বুঝলেন, কিন্তু দুর্ব্বলতাকে আর প্রশ্রয় দিলেন না, পাছে সে তাঁকে ক্রমশঃ একেবারে অধিকার করে বসে। বরং তিনি নিজেকে শক্ত করবার জন্যে

এই আজ্ঞা প্রচার করলেন যে, বাড়ীতে অপ্রকাশের নাম যেন কেউ না আনে, আর যদি কেউ তাকে কোন প্রকার সাহায্য করে তা' হ'লে সেও এ বাড়ীমুখো যেন না হয়। রায়-গৃহিণী যেমনি স্নেহপ্রবণ ছিলেন, তেমনি কঠোরও বড় কম ছিলেন না। ছেলের নাম সেই দিন থেকে তিনিও যে বন্ধ করলেন, আর মৃত্যু পর্যান্ত অপ্রকাশের নাম তাঁর মুখে কেউ কখনও শোনে নি কিংবা তার জন্যে তাঁকে বাইরে কোন দুঃখও কেউ কখনও কর্ত্তে দেখে নি। যে তেজ ভেতরে থাকলে জমিদার-গৃহিণী হ'তে পারা যায়, তা তাঁতে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, আর সে তেজের সদ্ব্যবহারও তিনি যথেষ্ট করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যে শমীতরুর মধ্যে আগুন থাকে বলে একটা প্রবাদ আছে সেটার প্রমাণ রায়-গৃহিণী ; কারণ ভেতরের এই গুপ্ত তেজে তিনি নিজেই দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন—তবে সেটা ব্যক্ত হ'ল সেই দিন যে দিন তিনি আর নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে একটা উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়ে, অব্যক্ত একটা চীৎকার করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ডাক্তার এসে বল্লেন যে মনে খুব জোর কোন আঘাত লাগার দরুণই এই রোগ, আর তাতে যে কোন সময়েই হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভৈরব রায় সমস্তই শুনলেন ও বুঝলেন, কিন্তু একটা বড় হুঁ বলে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। ডাক্তার

নিয়মমত ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তাতে রোগিণীর বিশেষ কোন উপকার বা অপকার হল না; কারণ রোগিণীর রোগ ঠিক্ যে কোথায় অর্থাৎ রোগের উৎপত্তিস্থল যে কোথায় তা তখন ডাক্তার তো জানতেন না। ওষুধে কোন ফল হ'ল না দেখে ভৈরব রায় একটু বেশীরকম গম্ভীর হয়ে গেলেন, বাড়ীর লোক একটু বেশীরকম অস্থির হয়ে উঠল। রোগিণী ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়তে লাগলেন, ডাক্তার একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ একদিন পাড়ার সকলে একটা পাগলাকে ঐ বাড়ীটার চারধারে ঘুরে বেড়াতে দেখলে। আমার স্ত্রী একদিন আমায় ডেকে বল্লে "হ্যাগা, ওকে ও বাড়ীর অপ্রকাশের মতন অনেকটা দেখতে নয়; ঠিক্ সেই লম্বা মুখ, ভাসা ভাসা চোখ্।" আমার তখন হুঁস হল, হাঁ তাইতো, এ যে আমাদের অপ্রকাশই! একদিন তাকে ডেকে বাড়ীতে নিয়ে এলুম; ঘরের মধ্যে ঢুকে আমায় একলা দেখে তার চোখ্ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল। আর তাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। সে আবার আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। এই রকমে দিন দশেক কেটে গেল। তারপর সেদিন যখন ডাক্তারদের মোটার ও গাড়ীতে ভৈরব রায়ের বাড়ীর সুমুখটা ছেয়ে গেছে—দরোয়ান ঝি চাকর সকলেই ব্যস্ত—কেউ ডাক্তার-

থানায় ছুটছে, কেউ গরম জল করছে ইত্যাদি—সেই সুযোগে ফাঁক পেয়ে পাগল আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে একেবারে মা'র ঘরের জান্‌লার গোড়ায় গিয়ে উপস্থিত। মার চোখ্‌ যেই পাগলের মুখে পড়েছে অমনি পাগল একেবারে মা'র বুকের উপর গিয়ে মুখ লুকোল। ডাক্তার বৈদ্য সকলেই স্তম্ভিত—এ কে! কেবল ভৈরব রায় নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মতন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কারণ এ যে কে তা তিনি খুব ভালই জানতেন। পরে যখন সকলে পাগলকে সরিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তখন তিনি বাধা দিয়ে পাগল ছাড়া আর সকলকে ঘর থেকে চলে যেতে বল্লেন। সকলে যখন অবাক্‌ হয়ে পাশের ঘরে গেলেন—তখন ছেলে মা'র গলাটি জড়িয়ে, মার রোগশীর্ণ মুখখানি নিজের বুকের মধ্যে চেপে ফোঁপাচ্ছে—তারপর ভৈরব রায় যখন গিয়ে এই মিলনস্থলে দাঁড়ালেন তখন কে যেন টেনে তার হাত পা দু'খানাকে পাগলের দিকে নিয়ে গেল। তিনি গিয়ে পাগলের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন শক্ত—তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে দেখেন, সাধ্বী এত সুখ সইতে না পেরে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছেন—তার হাত পা হিম হয়ে গিয়েছে, আর অপ্রকাশও অসাড় হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তাররা নাড়ী দেখে বুঝলেন তার প্রাণ আছে, সুতরাং তার মার দিকে আর

না চেয়ে যাতে অপ্রকাশের জ্ঞান সঞ্চার হয় তারই চেষ্টা করতে লাগলেন। খানিক পরে সে একবার চেয়ে মা'র কাগজের মতন সাদা মুখখানা দেখে সেই যে চোখ্ বোজাল তা আর খুলল না। আর আজ ঝি চাকরদের কান্নাই জানিয়ে দিয়ে গেল যে হতভাগার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

অরন্ধনের দিনে

১

"আমার বাড়ীতে কে আর বাসি পান্তা খেতে আসবে বোন্! তবে কি জান, মনসা পূজার দিন, বাসুকীর মাথায় মাটী পোড়াতে নেই, আর শ্বশুরকুলের এই একটা নেম চ'লে আস্ছে—বাসি ভাত ভাজা তরকারী খেতে হয়, সেই জন্যেই যা কিছু আয়োজন! তা' ছাড়া গাঁয়ের গরীব-দুঃখী দু'চার ঘর—বিশেষ আমাদের ধাই-গোষ্ঠার ঐ কাওরা ক'ঘর—ওরা বরাবর এই ভাদ্র-সংক্রান্তির দিনে আমাদের বাড়ীতে অরন্ধর প্রসাদ পায়; সেই জন্যেই বিশেষ করে এই বেঁধে রাখা! তা' না হ'লে পোড়া এই একটা পেটে একবেলা দু'টো দেবার জন্যে কি এত খেটে মরি!"

বৃদ্ধা নরসিংহের মা ভাদ্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে কচুর শাক কুটিতে কুটিতে সমাগতা প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলেন। প্রতিবেশিনী কহিলেন "তাও বলি দিদি!—তুমি দশজনের আয়োজন ক'রে ভালই কর। মনে কর, হঠাৎ যদি কোন কুটুম্ব সাক্ষাৎ-ই এসে উপস্থিত হ'ন!—তাদের ত আর তখন নেহাৎ গুড়-মুড়ি

খাইয়ে রাখ্‌তে পার্ব্বে না! আবার উনুনেও আগুন দিতে নেই!—এই দেখ না সবই প্রস্তুত রইল।—নিতান্ত তেমন প্রয়োজন না হয়—সন্ধ্যের সময় পাঁচজন গরীব-গেরস্থদের হাত তুলে দিয়ে ফেল্লে!—আমি ত বলি, দিদি, এটা তোমাদের সেকেলে খুব পাকা ব্যবস্থা।"

কথাটার কোথায় কি ছিল কে জানে!—শুনিবামাত্র বৃদ্ধা সহসা উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁলা! তুই কি বাড়ী বয়ে আমাকে ঠাট্টা ক'র্ত্তে এসেছিস্, না কি? একে এই ভাদ্রমাস, লোকে বলে বাড়ীর কুকুর বিড়ালটাকে পর্য্যন্ত বা'র হ'তে দেয় না!—তার উপর আবার সংক্রান্তি—অযাত্রা! এমন দিনে কি কেউ কখন কোথাও যায় আসে? তা ছাড়া, আমার আবার আত্মীয় কুটুম্ব!—জানিস্ কি না যে আমার তিন কুলে আপনার জন বল্‌তে কেউ নেই! আমার আত্মীয়ের মধ্যেও তোরা—আর কুটুম্বর মধ্যেও তোরা!—মর্‌বার সময় যে মুখে একরত্তি জল দেবে এমন একটা আপনার!—"

বৃদ্ধার আর বাঙ্‌স্ফূর্ত্তি হইল না; আবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় জলে ভাসিয়া উঠিল! বাম হস্তে বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "এমন পোড়া কপাল করেও এসেছিলেম—এমন রাক্ষসী আমি, যে তিন কুলে কাউকে রাখি নি!—যার বাড়া নেই পেটের পুত—

তাও দু'টো নয়, দশটা নয়—বত্রিশ নাড়ি ছেঁড়া একরত্তি শিবরাত্তিরের সল্‌তে, সেই-ই কোথায় চলে গেল। আজ দশ বচ্ছর বাছার কোন খোঁজ নেই—খবর নেই! আমি নিকশা বুড়ী অখণ্ড পেরমাই নিয়ে এই রাবণের পুরী আগ্‌লে ব'সে আছি!—এমন কপালও মানুষে করে!"

বৃদ্ধা নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনী প্রথমটায় নিতান্ত অপ্রতিভ, পরে বৃদ্ধার বিরূপ—অসংযত—ব্যবহারে বিরক্ত, শেষে তাঁহার দুঃখে শোকে ম্রিয়মাণ—বিষণ্ণ হইলেন; পরে প্রবোধচ্ছলে বলিলেন "কর কি দিদি! আজকের দিনে, এই ভরা সাঁজের সময়, এমন করে চোখের জল ফেলে বাছার অকল্যাণ ক'র্ত্তে আছে কি?—ছিঃ দিদি! অমঙ্গলের কথা মনে ঠাঁই দিও না! নরসিং তোমার ফিরে আস্‌বে—আবার তুমি ছেলে-বউ নাতি-পুতি নিয়ে সংসার পাতাবে—আবার সবই বজায় হ'বে!"

বৃদ্ধা অভিমানোদ্দৃপ্ত তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "সেই পোড়া-কপালেই ত আমার যত দুর্দ্দশার মূল!"

পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ কষ্টে সংবরণ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে নাক-চোখ মুছিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তোদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! প্রাতর্বাক্যে বাছা আমার সুভালয় ভালয় ফিরে আসুক! আমার আর

সংসারের সাধ নেই।—আমি এখন তার হাতের এক গণ্ডূষ জল পেয়ে মর্ত্তে পাল্লে'ই বাঁচি!"

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; সন্ধ্যার ঘোর ঘনাইয়া আসিতেছিল। "সন্ধ্যো হ'য়ে এল; আসি তবে দিদি আজ।" এই বলিয়া প্রতিবেশিনী গাত্রোত্থান করিলেন।

"হ্যাঁ—এস বোন্। কিছু মনে কোরো না! সেই পোড়া-কপালে আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে—বুকে দিবারাত্তির বিষের বাতি জ্বল্‌ছে! আমাকে একেবারে সংসারের বা'র কোরে রেখেছে! আমার কি আর মাথার স্থির আছে!—কি কথায় কি ব'লেছি, কিছু মনে কোরো না বোন্।"

"না দিদি; কি আর বোলেছো যে মনে কোর্ব্বো! তুমি বড় শক্ত মেয়ে, তাই এখনও সব বজায় রেখে সংসার-ধর্ম্ম কোরছো! অপর লোক হ'লে পাগল হ'য়ে পথে পথে বেড়াত! আহা! অতি বড় শত্তুরেরও যেন তোমার অবস্থা না ঘটে!"

বৃদ্ধা আবার কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁলা—তোরা বুঝি তাই মানাস্ যে আমি পাগল হ'য়ে পথে পথে ঘুরি?—কেন না? আমার আবস্থাটা কিসের? শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, আমার ষাটের বাছা ষষ্টির দাস নৃসিং দশজনের

একজন হ'য়ে যদি কখন দেশে ফেরে, তখন দেখ্‌বি শত্তুর ঝুরে মর্‌বে!"

প্রতিবেশিনী আৰ্ত্তস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, আমিও ত বল্‌ছিলেম! আহা! তোমার আঁচলের ধন, আঁচলে ফিরুক্! —সে ত তেমন ছেলে নয়; শত্তুরেও তার পানে ফিরে চায়!"

"তোমরা বোন্ পাঁচজনে তাকে আশীর্ব্বাদ কর। তোমাদের বাক্‌সিদ্ধি হউক!"

"আমরা ত দিদি দিনরাত্রিই দেবতাদের কাছে তাই মানাচ্চি। তবে এখন আসি দিদি!"

"আহা! এস বোন্। রক্ষর মা সেই যে বেরিয়েছে, এখনও পর্য্যন্ত দেখা নেই! আমিও যাই, হরির তলায়—ঘরে দোরে ধূনা গঙ্গাজল দিই গিয়ে।"

—বলিয়া বৃদ্ধা কুট্‌নার বারকোশ বঁটি তরকারীর চাঙ্গারিতে তুলিয়া ভাণ্ডার-গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রতিবেশিনী চলিয়া গেলেন; যাইতে যাইতে আপন মনে বলিলেন 'আহা! মাগি ছেলেটাকে অকারণ তাড়িয়ে দিয়ে, ভেবে ভেবে এদানিং পাগল হবার যো হ'য়েছে! একরত্তি মতি স্থির নেই!'

২

বৃদ্ধা, মহিম রায়ের গৃহিণী। দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে বৃদ্ধার মত সর্ব্বসুখে সুখিনী রমণী মহাকালী গ্রামে আর দ্বিতীয়া দৃষ্ট হইত না। শিবতুল্য স্বামী, কার্ত্তিকোপম পুত্র, মরাইভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, খামারপোরা 'খন্দ', আট দশ জোড়া বলদ, দেড় কুড়ি দু'কুড়ি গাই, চণ্ডীমণ্ডপ—আটচালা—দোলমঞ্চসমন্বিত প্রকাণ্ড ভিটা—চাকর-চাকরাণী কৃষাণ-মজুর অগণ্য—নিত্য অভ্যাগত-আগন্তুক-অতিথিসেবা—বার মাসে ছোটখাট তের পার্ব্বণ—লক্ষ্মীর বরযাত্রীস্বরূপ সুদূরসম্পর্কীয় নিঃসম্পর্কীয় জ্ঞাতিকুটুম্ব প্রভৃতিতে সারা বাটীখানি মুখরিত ছিল। আর এই সকলের একমাত্র কর্ত্রী-নিয়ন্ত্রী ছিলেন এই রায়-গৃহিণী। চওড়া কস্তাপেড়ে সাড়ীতে গাছকোমর বাঁধিয়া সিঁথায় এক কপাল সিন্দুর দিয়া—শাঁখা লোহার কোলে বাউটী খাড়ু-যবদানা-মরদানা-মুড়কীমাদুলী-নারিকেলফুলে প্রকোষ্ঠ আচ্ছাদিত করিয়া—পরাতে অন্নব্যঞ্জন লইয়া যখন তিনি পরিবেশন করিতে ব্যাপৃতা থাকিতেন, তখন পথের শত্রুও ফিরিয়া চাহিত, বলিত যেন কৈলাস হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কাল কিন্তু চিরকালই ক্রীড়া-কুশল; তাবৎ সৃষ্ট পদার্থ তাহার নিত্য ক্রীড়নক। সে ক্রীড়াচ্ছলে আজ যাহাকে সুসজ্জিত করিয়া সাধারণসমক্ষে উপনীত করিতেছে, পরদিনই হয়ত তাহাকে একেবারে নিরাভরণ করিয়া একপার্শ্বে ফেলিয়া দিতেছে। তাহার সেই রহস্যময়ী রসখেপামি বশেই সে সহসা একদিন মহিমচন্দ্রকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাজিকরের বাজির মত—বালুকাগঠিত গৃহমন্দিরের মত—তেমন সুসজ্জিত সংসার, কোথায় কি হইয়া গেল! এমনই ত ঘটিয়া থাকে। যেমন ১ অঙ্ককে আশ্রয় করিয়া তাহার পৃষ্ঠবর্ত্তী 'শূন্য'গুলি ক্রমান্বয়ে দশগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া শোভমান হয়, কিন্তু সেই পুরোবর্ত্তী ১টি বিলুপ্ত হইলে 'শূন্য' যতগুলিই থাকুক না কেন, সেগুলি মাত্র শূন্যেই পর্য্যবসিত হয়, তেমনই সেই 'এক' অঙ্কস্বরূপ কর্ত্তা মহিম রায়ের লোকান্তর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অমন সুবিন্যস্ত সংসারটি সহসা শূন্য হইয়া পড়িল। ব্যক্তিগত প্রভাব এমনই প্রবল প্রতাপশালী!—সে আজ দশ বৎসরের কথা, রায়-দম্পতির একমাত্র সন্তান নৃসিংহ তখন সপ্তদশবর্ষীয় বালক মাত্র।

যখন পিতৃবিয়োগ ঘটে, নৃসিংহ তখন কলিকাতায় থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে বি, এ—তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। পিতার মৃত্যুকালে সে বাটীতেই

ছিল—তখন গ্রীষ্মাবকাশ। শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া সে যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করে, তখন পুত্রমাত্র সম্বল রায়-গৃহিণী ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আবাল্য সহরাঞ্চলে, প্রতিভাবান্ সহপাঠিবর্গের সংসর্গে যাপন করিয়া পুত্র নৃসিংহের হৃদয়ে যে সকল উচ্চাভিলাষ—মহতী আশা—অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেগুলিকে পুষ্ট—বর্দ্ধিত—পরিণত—ফলবান্ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা—দুর্জ্জয় প্রলোভন—হেলায় পরিত্যাগ করিতে—এককালে বিসর্জ্জন দিতে—নৃসিংহ নিতান্তই কুণ্ঠিত—এককালেই অস্বীকৃত।

রায়-গৃহিণী শৈশবাবধি চিরকাল স্নেহে সোহাগে লালিতা-পালিতা—বিপত্নীক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণের একমাত্র মাতৃহীনা দুহিতা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত স্বনামধন্য মহিমচন্দ্র রায়ের দয়িতা, তিনি যখন যাহা ধরিয়াছেন, তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন—যখন যেটি চাহিয়াছেন, তখনই সেটি পাইয়াছেন—তাঁহার কোন সাধ কখনও অপূর্ণ থাকে নাই—তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন কার্য্যই করিতে সাহসী হয় নাই। স্বামী লোকান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একমাত্র পুত্র তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচারী হইতেছে,—অভিমানে, অপমানে, ব্যর্থরোষে, দুঃসহ মনোক্লেশে তিনি হিতাহিত জ্ঞানহারা হইয়া পুত্রের প্রতি যথেষ্ট কটূক্তি

করিলেন। পুত্র জননীর সহিত অধিক বাক্‌বিতণ্ডা করিল না, কিন্তু স্পষ্টই জানাইল—সে স্বীয় কল্পিত মহদুদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—বদ্ধপরিকর। যে উন্নত—মহান্ আদর্শ সে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে—যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে আবাল্য বদ্ধমূল হইয়াছে—সে অটলভাবে, প্রাণপণে—তৎসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাতৃদেবী যতই বলেন, রমণীজনসুলভ যুক্তি দর্শাইয়া, পুত্রকে যতই নিজ অভিমত পথে আনয়ন করিতে প্রয়াস করেন, পুত্র তদুত্তরে সানুনয়ে কেবল একই কথা বলে—

"মা! তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন মানুষ হ'তে পারি!"

৩

পুত্র উচ্চ আদর্শানুযায়ী সাংসারিক জীবনের সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া মাতার কল্পনানেত্র ঝলসিয়া দিতে যতই চেষ্টা করে, মাতাও তদনুরূপ উজ্জ্বলতর গার্হস্থ্য জীবনের চরমোৎকর্ষ চিত্র তৎপার্শ্বে স্থাপিত করিয়া পুত্রকে মোহিত করিবার চেষ্টা করেন।—অতঃপর গ্রামে থাকিয়া, অপকর্ষ-পূর্ব্বক সপিণ্ডকরণান্তে একটি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিয়া স্বর্গগত কর্ত্তার পদাঙ্ক অনুসরণে তদীয় কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিতে—তাঁহারই আদর্শে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ—সংসারধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই যে সৎপুত্রের কার্য্য, তাহাতে সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্য সকলই যে অব্যাহত থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাতৃদেবীরও সংসারের অবশিষ্ট সাধগুলি মিটিবে—মাতা নানামতে পুত্রকে এই সকল কথা বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। এইরূপে সপ্তাহকাল কাটিয়া গেল—কলিকাতায় কালেজ খুলিয়াছে, আর বসিয়া থাকা চলে না। কিন্তু হায়! যুক্তি তর্ক কিছুতেই কোনও ফল দর্শিল না। পুত্রের দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞার সম্মুখে মাতার শত প্রবোধ বাক্য, সকলই ভাসিয়া গেল—সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিস্ফল হইল। অবশেষে ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে পুত্রবৎসলা সদ্যস্বামীবিধুরা বিধবা রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "আচ্ছা বাছা! তোমারই জেদ্ বজায় থাকুক। যাও—ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লক্ষপতি হইয়া যদি কখনও গৃহে ফিরিতে পার, তবেই ফিরিও—সুপুত্র বলিয়া বুকে লইব। নচেৎ জানিব তুমি আমার নিতান্তই কুপুত্র—কুপুত্রের মাতা হওয়া অপেক্ষা অপুত্রক হওয়া শ্রেয়ঃ—আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না। মনে থাকে যেন, যতদিন আমার এ আশাটুকু পূর্ণ করিতে না পার, ততদিন তোমার পক্ষে আমি মৃত।"

পুত্রের প্রতি এই ভীষণ কঠোর উক্তিগুলি মাতার পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ হইল। কিন্তু কুসুমেও বজ্রকঠোরতা নিহিত থাকে—যে যত কোমল, অবস্থা বিশেষে সে ততই নির্ম্মম—কঠোর হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মাতার ঈদৃশ সর্ত্ত-সমন্বিত অনুমতি পাইয়াও নৃসিংহ কৃতার্থ বোধ করিল। অতঃপর কালবিলম্ব করিলে অপত্যস্নেহান্ধ মাতার মত পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, আশঙ্কা করিয়া সে যথাসম্ভব সত্বর গমনোদ্যোগী হইল।

বিদায়কালে পুত্র যখন মাতৃদেবীর পদবন্দনা করিতে গেল, মাতার হৃদয় তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তিনি

বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্যা-প্রায় হইয়া গেলেন—তাঁহার বাঙ্স্ফূর্ত্তি হইল না। পুত্র যখন মাতৃ-চরণে প্রণিপাত করিল, মাতা নির্ব্বাক্ হইয়া পুত্রের শিরোস্পর্শ করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, তখন উভয়ের চক্ষেই সৃষ্ট পদার্থ তাবৎ দ্রুতবেগে বিঘূর্ণিত হইতেছিল।

নৃসিংহ অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—রায়-গৃহিণী বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, স্থাণুর ন্যায়, একই স্থানে বসিয়া আছেন! একটা কাক আসিয়া তাঁহার অদূরে বসিয়া—তাঁহার মুখের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া—ঘন ঘন 'কা—কা' রবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সহসা কাকের কর্কশ-রবে তাঁহার বাহ্যজ্ঞানোন্মেষ হইল; তিনি শূন্য নয়নে এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া, একটা বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশ—আকুল-কণ্ঠে বলিলেন "চ'লে গেছে!"

সেই উচ্ছ্বসিত মাতৃকণ্ঠ-রবে কতখানি আশীষবাণী নির্গত হইয়া নৃসিংহের রক্ষাকবচের ন্যায় তাহার সহগামী হইয়াছিল কে জানে!

রায়-গৃহিণী আদর্শ দৃঢ়চিত্তসম্পন্না রমণী! অতঃপর তিনি পাষাণে বুক বাঁধিয়া একে একে ধীরে ধীরে যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির যথাসম্ভব বিলি-ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গাভীগুলিকে পোষাণী দিলেন—জমিজায়গা সব ভাগে ধরাইয়া দিলেন—চাকর-বাকর সকলকে সসম্মানে

বিদায় দিলেন—সংসারে রাখিলেন কেবল একমাত্র প্রাচীনা পরিচারিকা রক্ষর মাকে।

মাতৃচরণে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে নৃসিংহ মাতাকে আর কোনও সংবাদই দেয় নাই—মাতৃ-আজ্ঞার অন্ততঃ এই কথাটি সে বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছিল। মাতা, পুত্রের সংবাদ পাইবার উদ্দেশে নানারূপ চেষ্টা—উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; বৎসরেক পরে—স্বামীর সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরের অব্যবহিত পূর্ব্বে শুনিলেন, পুত্র বি, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। তখন একবার তাহার অনুসন্ধান উদ্দেশ—পাইবার জন্য মাতার পক্ষ হইতে অনেক চেষ্টা ও ব্যয় করা হইয়াছিল, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে যে কোথায়, কি অবস্থায় রহিল—আছে, কি নাই—তাহার কোনও সংবাদই পাওয়া গেল না! সে যেন হঠাৎ জনসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল! মাতার আশান্বিত হৃদয়ে কিন্তু একটা সুতীব্র আশা জাগিয়া রহিল যে পুত্র যখন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি জননীসুলভ অভিমানবশে যাহাই কেন বলিয়া থাকুন না, পিতার সপিণ্ডকরণের পূর্ব্বাহ্নে সে অবশ্যই দেশে ফিরিবে।—পুত্রবিরহকাতরা বিধবা সেই গণাদিন গণিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

৪

মহাকালী গ্রামটি যেন আধুনিক সভ্যজগতের একটু দূরে অবস্থিত—ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্রোতঃ এখনও যেন সে সুদূর গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই! তাই, তদঞ্চলের লোকগুলার হাবভাব চালচলন আচারব্যবহার এখনও অনেকটা যেন সেকেলে ধরণের রহিয়া গিয়াছে! বাস্তুপ্রিয়—প্রবাসবিমুখ বলিয়া বাঙ্গালীর একটা সত্যমিথ্যাময় অপযশঃ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। এই নাতিবৃহৎ গ্রামটুকুর অধিবাসিবৃন্দ বাস্তবিকই এ বিষয়ে খাঁটি বাঙ্গালী। ব্যবসায় ব্যপদেশেই বল, অথবা অন্যবিধ যে কোনও উপায়ে অর্থার্জ্জনের অভিপ্রায়েই বল, এমন কি তীর্থপর্য্যটনচ্ছলে পর্য্যন্ত, মহাকালী-গ্রামের বাসিন্দা বড় একটা কেহ সহজে বিদেশে যাইতে চাহিত না। তাহার উপর আবার যে দু'দশজন এতাবৎ অসম-সাহসের পরিচয় দিয়া ভাগ্যান্বেষণে বা অপর কোনও উদ্দেশ্যে দেশান্তরে বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর দেশে ফিরে নাই!

আর যে দু'একজন বা ফিরিয়াছে, তাহাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে—কিন্তু সেটা উন্নতির দিকে নহে, অধঃপতনের দিকে।

নৃসিংহকে যখন মহিম রায় গ্রাম্য পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া বহুব্যয়ে কলিকাতায় প্রেরণ এবং তথায় রাখিয়া তাহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তখন মহাকালী গ্রামের ভূয়োদর্শী অনেক প্রবীণ অনেক কথা বলিয়াছিলেন; কোনও কোনও ভবিষ্যদ্দর্শী বালকের সম্বন্ধে নানা ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছিলেন। এই সকল কথা কালে লোকপরম্পরায় রায়-গৃহিণীর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি স্বামীর স্বর্গারোহণের পরে পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইতে তেমন দৃঢ়ভাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল আপত্তির শেষে কি পরিণাম ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

পিতার আদ্যশ্রাদ্ধান্তে যেদিন নৃসিংহ গ্রাম হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করে, সেদিনের কথা এখনও গ্রামের অনেকেরই মনে আছে। তখন কিন্তু সকলেরই স্থির বিশ্বাস ছিল, সে পিতার বাৎসরিক সপিণ্ডকরণ উপলক্ষে যথাসময়ে নিশ্চয়ই দেশে ফিরিবে।

কিন্তু হায়! ক্রমে সেই বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-বাসর সমাগত-প্রায়, অথচ নৃসিংহের কোনও সন্ধানই নাই! তথাপি

যথাসম্ভব উদ্যোগ-আয়োজন হইল—পুত্র উপস্থিত হউক বা না হউক, পিণ্ডদান কার্য্য স্থগিত থাকিবে না ; উপযুক্ত প্রতিনিধি—অভাবে, স্বয়ং বিধবা দ্বারা কার্য্য সমাধা করিতেই হইবে। অগত্যা হইলও তাহাই ! তবে সে শ্রাদ্ধে তেমন সমারোহ কিছুই হয় নাই—যাহা না হইলে নয়, মাত্র তাহাই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। অভাগিনী আশার যে সূক্ষ্মসূত্র ধরিয়া এতদিন সোৎসাহে যাপন করিতেছিলেন, এইবার তাহা নির্ম্মূল হইল ! তিনি পুত্রমুখ পুনর্দ্দশনে এইবার নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে নানা কু গাহিতে লাগিল ! কিন্তু বিধির বিচিত্র বিধানে একটা জটিল রহস্য জননী মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন—পুত্র যত দূরদেশেই থাকুক না কেন, সে কখন অসুস্থ হইল—কখন বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়া পড়িল—মাতার আত্মা যেন সেটা তৎক্ষণাৎ অনুভব করিয়া থাকেন। পুত্র প্রবাসে সুখ-শান্তিতে সুস্থ থাকিলে মাতার আত্মা স্বতঃই প্রশান্ত থাকে ! হঠাৎ প্রবাসী পুত্র কোনও অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপৎপাতে অভিভূত হইলে, সুদূর ধরাপ্রান্তে অবস্থিত থাকিয়াও কি যেন কোন অজানা কারণে মাতার প্রাণ উদ্বিগ্ন—অস্থির—আকুল হইয়া উঠে ! ইহাকে দূরানুভূতিই বল, আর সূক্ষ্মানুভূতিই বল, অথবা অন্তর্দৃষ্টিই বল, মেয়েলী কথায় ইহাকে 'নাড়ীর টান' বলে ! এইরূপ একটা বিচিত্র প্রভাব ভগবানের রাজ্যে

আছে বলিয়াই নৃসিংহ-জননী এখনও বাঁচিয়াছিলেন! সময়ে সময়ে চিত্তদৌর্ব্বল্যবশতঃ নানা কুচিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইলেও, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইত পুত্রের প্রাণহানি ঘটে নাই—সে যেখানেই থাকুক, বাঁচিয়া আছে। তথাপি, একাদিক্রমে এই সুদীর্ঘকাল পুত্রমুখ অদর্শনে তিনি সাতিশয় কাতরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় তিনি জরাগ্রস্তা হইয়া পড়িলেন; পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার ন্যায় দেখাইত! তাই তাঁহাকে আমরা এতাবৎকাল 'বৃদ্ধা' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি। যখনই তাঁহার মনে পড়িত, যে তাঁহারই কথায় নৃসিংহ এই সুদীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাস করিতেছে, তখন আত্ম-গ্লানিতে তিনি মর্ম্মে মরিয়া যাইতেন! এমন দিবারাত্রে প্রতিনিয়ত তিনি বহুবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেন। ভাবনা-ভারে তাঁহার শিরোদেশ—কেশপাশ—তুষারশুভ্র; অহরহঃ অন্তরে শত-বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণায় তাঁহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিয়াছিল! বস্তুতঃই এবংবিধ অবস্থায় পতিত হইয়া যে বৃদ্ধার প্রকৃতিবিপর্য্যয়—স্বভাববিকৃতি ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রতিবেশিনী যথার্থই বলিয়াছিল, তিনি যে এতদিন উন্মাদিনী হইয়া উঠেন নাই,—ইহাই তাঁহার পরম পুণ্যফল!

সে যাউক, যাহা বলিতেছিলাম—সেই সাম্বাৎসরিকের পর এক এক করিয়া যখন ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর কালগর্ভে বিলীন হইয়া গেল, অথচ নৃসিংহের কোনও তত্ত্বই পাওয়া গেল না, তখন গ্রামবাসীরা মনে মনে স্থির বিশ্বাস করিল—অভাগিনীর একমাত্র অঞ্চলের নিধি আর ইহজগতে নাই!—থাকিলে অবশ্যই কাক-মুখেও একটা সংবাদ পাওয়া যাইত!

৫

প্রতিবেশিনীকে বিদায় দিয়া নৃসিংহের মা ঘরে দ্বারে ধূনা গঙ্গাজল দিয়া, হরির তলায় প্রদীপ জ্বালিয়া, শঙ্খধ্বনি করিয়া, সান্ধ্যকৃত্যাদি করিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

ইতোমধ্যে রক্ষর মা একেবারে কাপড় কাচিয়া প্রত্যাগতা হইল। কাপড় ছাড়িয়া ভাণ্ডার-ঘর হইতে সেই তরকারির চাঙ্গারি বাহির করিয়া সকল কুটনা কুটিয়া ফেলিল। পরে পাকশালায় প্রবেশ করিয়া চুল্লীতে অগ্নি প্রয়োগ করিল।

আহ্নিককৃত্যাদি সমাপনান্তে বৃদ্ধা আসিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন; রক্ষর মা যোগাড় দিতে লাগিল, এবং সাবকাশ কালে কখনও বা রন্ধন-গৃহের চৌকাটে ঠেশ দিয়া, কখনও বা দাওয়ায় অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া মুড়ি-মুড়কি চিঁড়া-গুড়ের সৎকার করিতে লাগিল।

প্রতিবেশিনীকে বিদায় দিয়া অবধি আজ কেমন রায়-গৃহিণীর মনোমধ্যে বারংবার নৃসিংহের মুখ জাগিয়া উঠিতেছিল!

তিনি অনন্যমনে চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিলেন।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—গ্রাম্য চৌকিদার শেষ রোঁদ ফুকারিয়া ইহার বহুপূর্ব্বেই স্বগৃহে শয্যাশায়ী হইয়াছে। ক্বচিৎ দূরে দুই একটা গ্রাম্য কুক্কুর থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিতেছে। যামঘোষগণ নাতিপূর্ব্বে দলে দলে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দ্বিযাম-অতীত-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া নিস্তব্ধ হইয়াছে। ঝিল্লীরবে দিগন্ত মুখরিত। নৃসিংহের মা একে একে মান, মাখমশিম, বিলাতী কুমড়া, নারিকেলখণ্ড, করলা, বেগুন, আলু প্রভৃতি ভাজা, মসূরডাল, চড়্‌চড়ি, কচুশাক ঘণ্ট, নারিকেল কুমড়ী, চাল্‌দার অম্ল, প্রভৃতি রন্ধন শেষ করিয়া, তিন তোলো ভাত নামাইয়া তাহাতে জল ঢালিয়া, সব গুছাইয়া রাখিয়া রন্ধনশালা হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। রক্ষর মা তখন অগাধে নিদ্রা যাইতেছিল—তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া দিলেন। সে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে উঠিয়া হেন্‌শেলশালা নিকাইতে সুরু করিল—নৃসিংহের মা দাওয়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। অবশেষে যখন তাহার কাজকর্ম্ম সব শেষ হইল, তখন উভয়ে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রে যখন রায়-গৃহিণী একটু গুড় গালে দিয়া এক ফেরো জলপান করিয়া শয্যাশায়িনী হইলেন,

তখন যামঘোষবর্গ শেষ-যাম ঘোষণা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

পরদিন ভাদ্র-সংক্রান্তি; মনসা পূজা প্রতি গৃহস্থের চুল্লীতে মনসাগাছ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস্তু-পূজা, আবার গ্রাম্য মনসা-তলায় গ্রামবাসীর যৌথপূজা; আবার বিশ্বকর্ম্মা পূজা —শিল্পকারুকরদিগের যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র পূজা; উপরন্তু আজ প্রতিপদ—অপরপক্ষ শ্রাদ্ধতর্পণ আরম্ভ। উষা শেষ হইতেই সমগ্র গ্রামখানি যেন উৎসবে মাতিয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতেই নদীতীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কলরবে মুখরিত! দ্বিজাতীয় সংস্কৃত শূদ্র, মৃতপিতৃক ও পুত্রপৌত্র-বিহীন ক্বচিৎ দুই একজন বিধবা সকলেই নদীতীরে তর্পণ করিতে ব্রতী। কেহবা জলে আর্দ্রবাসে, কেহবা তীরে বসিয়া এক পাদ জলে ও অপর পাদ স্থলে রাখিয়া, দক্ষিণহস্তের অনামিকায় স্বর্ণ-রজত বা কুশনির্ম্মিত অঙ্গুরী ধারণ করিয়া, কেহবা যব ও ত্রিপত্র দ্বারা, কেহবা তিল ও কুশ-মোটকদ্বারা তর্পণ করিতেছেন। কেহ স্নানান্তে আচমন করিতেছেন, কেহ তিলক ধারণ করিতেছেন, কেহ শিখাবন্ধন করিতেছেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ প্রাচীনাবীতী, কেহবা উপবীতী, কেহবা নিবীতী হইয়া, কেহ 'কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্কর' প্রভৃতি পুণ্যতীর্থচয়কে তর্পণকালে আবাহন করিতেছেন

—কেহবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-প্রজাপতিকে তৃপ্ত করিতেছেন, কেহবা—

"দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপেঽধর্ম্মেরতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥"

—মন্ত্রে চরাচরের জীবমাত্রের উদ্দেশে জলগণ্ডূষ দান করিতেছেন। আবার কেহ উত্তর, কেহবা পশ্চিম মুখ হইয়া সনক-সনন্দ তৃতীয় সনাতন কপিল অনিরুদ্ধকে অম্বুদ্বারা তৃপ্ত করিতেছেন। এইরূপে কেহবা পূর্ব্বমুখী হইয়া ঋষিতর্পণ—কেহবা দক্ষিণাস্য হইয়া দিব্যপিতৃতর্পণ—কেহ যমতর্পণ—কেহ ভীষ্মতর্পণ—কেহবা পিতৃতর্পণ—কেহ লক্ষ্মণতর্পণ করিতে ব্যাপৃত! নদীকূলে যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে!

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিয়া সাধ্যমত পূজার উদ্যোগ করিয়া দিবার অভিলাষে—উপকরণ চয়ন-কল্পে দলে দলে ইতস্ততঃ ছুটিয়া ফিরিতেছে। ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী, দূর্ব্বা, যে যাহা যেমন পারিতেছে, আহরণ করিয়া ফিরিতেছে।

পুরলক্ষ্মীরা শেষনিশা হইতেই স্নানাদি সারিয়া গৃহের

সৌষ্ঠবসাধন করিতেছে—ঘর দ্বার নিকাইতে মুছাইতে, আলপনা দিতে, তৈজসাদি সুমার্জ্জিত করিতে, নৈবেদ্যাদির উপকরণ প্রস্তুত ও যথাযথভাবে সজ্জিত করিতে, তালপাটালি পাতিতে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। আজ আর রন্ধনপাটের হাঙ্গামা নাই—সুতরাং তাঁহাদের সমুদায় শক্তি আজ পূজায়োজনে নিয়োজিত। পুরুষ-প্রবরেরা 'ব্রাহ্মণের ছোট,—বেদের বড়' নির্ব্বিশেষে ফাইফরমাইস খাটিতে নিযুক্ত; কর্ত্তাব্যক্তিরা আদেশ-উপদেশ দিতেছেন; যুবাজনেরা দোকানপশরা করিতে, ফষ্টিনাষ্টি করিতে, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে ব্যতিব্যস্ত! আবাল-বৃদ্ধ বনিতার কর্ম্মব্যস্ততা—সজীবতা—প্রফুল্লতা নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় গ্রামখানি যেন আজ নবজীবনে উদ্বোধিত।

প্রত্যেক গৃহস্থ-বাটীতে প্রতি কারু-কর্ম্মশালায় এইরূপ পূজাপ্রকরণ ব্যবস্থিত।

ক্রমে চারিদিক্ হইতে শঙ্খ-কাংস্য ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইল। ছেলেরা লণ্ঠনে প্রদীপ লইয়া গ্রাম্য মনসাতলার পানে চলিয়াছে। দিক্‌দিগন্ত ধূপধূনা, গুগ্‌গুলু ও বিচিত্র ফুল-চন্দন-বিল্বদল-মিশ্রিত সুগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। সে অনাবিল হর্ষ-উদ্যম-উৎসাহ-যত্ন—সে উন্মাদনাময় সুরভিসম্ভার—সে অনির্ব্বচনীয় দিব্য-প্রভাব—যেন দেশব্যাপী সংক্রামক। তাহা বর্ণনাতীত—প্রত্যক্ষ উপভোগ্য!

বেলা প্রায় যখন একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ, তখন প্রাতঃকালীন পূজা সমাপ্ত হইল! এইবার গ্রামের হীনজাতীয় দীন-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলে মিলিয়া কাঁসী বাটী থোরা লইয়া স্থানীয় বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ বাটীতে পান্তা মাগিতে চলিয়াছে। সেই বাসি ভাত-ব্যঞ্জন পাইয়া বেচারাদের কি আন্তরিক আহ্লাদ—কি ঐকান্তিক পরিতুষ্টি! সেই যথা-সাধ্য দান করিয়া দাতৃবর্গের কি পরম পরিতোষ—কি অপার তৃপ্তি!

৬

৺মহিম রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বংশপরম্পরানুষ্ঠিত বিশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত অপর সকল ক্রিয়াকলাপ রহিত হইয়াছে। তাঁহার শ্রাদ্ধের পর হইতে কৌলিক ক্রিয়া কর্ম্মাদি, বার-ব্রতাদি যাহাও কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে আর তেমন আড়ম্বর সমারোহ কিছুই হয় না—মাত্র নিয়ম রক্ষার্থ যতটুকু না করিলে নহে, তাহাই করা হয়। সেই শ্রাদ্ধকার্য্যের পর হইতে রায়েদের ভিটার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে আর বড় একটা তেমন লোক-সমাগমের সুযোগ সংযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রায়-গৃহিণী সাধ্যমত কর্ত্তার আমলের বিশিষ্ট বার-ব্রতগুলি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার আমলে যে ক্ষেত্রে শতাধিক লোক আমন্ত্রিত হইত, এখন তদুপলক্ষে দশ-বিশজন মাত্র নিমন্ত্রিত হয়। সকল ক্রিয়াই এইরূপ সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অরন্ধনের দিনের আয়োজন বিশেষ কমাইতে পারেন নাই।

ইহার একমাত্র কারণ, অপরাপর বার-ব্রতে স্বেচ্ছামত নিমন্ত্রণ করা চলে,—এই দরিদ্রতোষিণী ক্রিয়া প্রধানতঃ নিমন্ত্রণ-প্রথা সাপেক্ষ নহে। গরীব-দুঃখীরা অযাচিতভাবে আশা-উৎফুল্ল হৃদয়ে দ্বারস্থ হয়, তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই!

ফলে, আজ অনেককাল পরে রায়বাড়ী অপেক্ষাকৃত বহুলোক সমাগমে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। গ্রামের ইতর গরীব যাহারা কর্ত্তার আমলে এই দিনে আসিয়া জুটিত, এতকাল আর আসে নাই, তাহাদের অনেকেই আজ সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দেখা দিল। ইহার একটু কারণ ছিল; রায়-গৃহিণীর রন্ধন নিপুণতার কথা—তাঁহার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জনের অমৃতোপম আস্বাদনের প্রশংসা এবং পরিতৃপ্তরূপে ভোজনোপযোগী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পরিবেশনের কথা দেশের লোকের অজ্ঞাত ছিল না। এ বৎসর কতকটা অজন্মা হওয়ায় গরীব-দুঃখীরা একদিনও পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিতে পায় নাই। আজ সেই খেদ মিটাইবার আশায় সকলেই আসিয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইতেছে!

তাহাদের আগমন-সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র নৃসিংহের মা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া প্রফুল্লমুখে সুমিষ্ট-বচনে সকলকে সাদরাভ্যর্থনা করিলেন—প্রাঙ্গণে বসিতে বলিলেন; কিন্তু

মনে-মনে একটু চিন্তান্বিতা হইলেন। ইদানীং অরন্ধনের দিনে সাধারণতঃ যে কয় ঘর "বাসি-পান্তা" লইতে আসিত, তিনি সেই আন্দাজেই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ এই সকাল হইতেই যখন উপরি-লোক আসিতে লাগিল, তখন সঙ্কুলান হইবে কিরূপে? যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় পাকা গৃহিণী এ হেন সামান্য কারণে বিচলিত হইবার নহেন। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া রক্ষর মাকে ডাকিয়া খিড়্‌কী-পথে উত্তম চিপিটক, মুড়কী ও দধি যথেষ্ট পরিমাণে আনিতে পাঠাইলেন। গুড়ের 'নাগরী' ও কদলীর 'কান্দি' ঘরেই মজুত ছিল। এদিকে তিনি পুনরায় বহির্ব্বাটীতে আসিয়া আগন্তুকদিগের সহিত তাহাদের পারিবারিক ও গৃহস্থালীর কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরে রক্ষর মা গোয়ালা-বাড়ী হইতে দধির ছোপা, এবং সেই পল্লীগ্রামের মুদীর দোকানে যতদূর পাওয়া যায়, চিপিটক, মুড়কী সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ দ্বার-পথে প্রত্যাবৃত্তা হইল। তাহার সাড়া পাইয়াই রায়-গৃহিণী শশব্যস্তে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণেই গাছকোমর বাঁধিয়া যথাক্রমে অন্ন-ব্যঞ্জনের থালা লইয়া পংক্তিবদ্ধ আগন্তুকদিগের স্ব স্ব তৈজসে পায়স দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশনান্তে সহাস্য আননে বলিলেন ;—

"বাছারা! আমি একলা মানুষ, তেমন বেশী আয়োজন করিতে পারি নাই। ভাত-তরকারি বোধ হয় ভরপেট হইল না! বোস, দুটি-দুটি জলপানও দিই।"

তখন আবার ধামায় করিয়া জলপান আনিয়া সরা-সরা দিয়া গেলেন; তারপর যথাসম্ভব গুড়, কলা, দধি বণ্টন করিলেন। অবশেষে, একটু কুণ্ঠিতভাবে, "আমি বাবা তোমাদের জন্য মাছ রাঁধিতে পারি নাই—তাই এই মাছের জন্য যৎকিঞ্চিৎ ধর।" বলিয়া প্রত্যেককে চারিটি করিয়া পয়সা দিলেন। সমবেত সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া রায়-গৃহস্থের জয় জয়কার ঘোষণা করিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে অমরাবাসীদিগের সহিত মহিমচন্দ্র এ দৃশ্য দেখিয়া গর্ব্বানুভব করিতেছিলেন। রায়-গৃহিণীর কিন্তু কি একটা আকুল-রুদ্ধ-আবেগে হৃদয় উথলিয়া নেত্রদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল!

একদল বাহির হইয়া গেল, পরক্ষণেই আবার একদল আসিল। তাহারা থাকিতে থাকিতেই আবার আর একদল আসিয়া উপস্থিত! মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় রায়-গৃহিণী আনন্দোচ্ছ্বসিত আননে—ক্ষিপ্রগতিতে অক্লান্তভাবে সকলকেই সমানে অন্নাদি বিতরণ করিতেছেন! তাঁহার যেন আজ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। স্বয়ং লক্ষ্মীর হাতেই বুঝি আড়ি!

ফলে, নৃসিংহের মার অন্তকার ব্যবস্থাটা আশপাশের গ্রামস্থ দীন দুঃখীদের মধ্যে, লোক-পরম্পরায় বিদ্যুৎ-গতিতে প্রচারিত হইয়া পড়ায়, ক্রমে শতাধিক লোক আসিয়া তাঁহার দান লইয়া গেল! প্রবীণ গৃহিণী গৃহস্থালী কার্য্যে সুনিপুণা রায়-জায়া, অপূর্ব্ব বুদ্ধি-কৌশলে আজ যেন শ্রীকৃষ্ণের সেই "ভাত রোঁড়" পর্ব্বের, অথবা মহাপ্রভু যিশুখৃষ্টের সেই ভুবন-বিদিত মহাভোজের সংক্ষেপে পুনরভিনয় করিলেন!

৭

এই অন্নাদি বিতরণ কার্য্যে বেলা দুইটা অতীত হইয়া গিয়াছে—তখন বোঝা গেল, আর কেহ আসিবার সম্ভাবনা নাই! গ্রামের চারিদিকে তখনও বিপুল বাদ্যোদ্যমে বিশ্বকর্ম্মা পূজা চলিতেছে; রায়-গৃহিণী ক্লান্তি-অপনোদন মানসে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছেন; ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া বাসিমুখে জল দিবেন। এমন সময়ে সদর দরজার সম্মুখে কি একটা গোলযোগ—কলধ্বনি শুনা গেল। রক্ষর মা তাড়াতাড়ি দেখিতে গেল—আবার ব্যাপার কি! এমন সময়ে একটা ডাকাডাকির শব্দ শুনা গেল। কে ডাকিল, "মা-ঠৌরেণ্ গো!" সে শব্দ সহসা—কে জানে কেন—বজ্রতুল্য তীব্রবেগে রায়-গৃহিণীর অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিয়া, তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল! এমন সময়ে রক্ষর মা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে দ্রুতবেগে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ও মা! নসু এসেছে! বড় ব্যায়রাম।"

পাগলিনীর ন্যায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা আত্মহারা গৃহিণী

ঊর্দ্ধশ্বাসে বহির্ব্বাটীতে ছুটিলেন, এক সুকুমার-কান্তি যুবক দ্বারদেশে অবস্থিত শিবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। গৃহিনী তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন না; অনন্যমনে শিবিকাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া শায়িত মূর্ত্তিপানে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জ্ঞানশূন্যা হইয়া বাতাহতা কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতনোন্মুখী হইলেন, পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী রক্ষর মা ছুটিয়া ধরিল! পরক্ষণেই চৈতন্যোদয় ঘটিলে তিনি সেই রুগ্ন-জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার পুত্রের মুখমণ্ডলে অসংখ্য চুম্বন করিতে লাগিলেন। দরদরধারে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। এতদিনের পর পুত্র-শোকাতুরা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে পুত্রমুখ দেখিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। মৃতকল্প শবোপম নৃসিংহের ত কথা কহিবার সামর্থ্যই নাই—সেও নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

নৃসিংহ ফিরিয়াছে নিজ প্রতিশ্রুতি ও মাতৃদেবীর আশীর্ব্বচন পূর্ণ করিয়াই—লক্ষপতি হইয়াই ফিরিয়াছে। সে পাতিয়ালাধিপতির পার্শ্বচর। তাহার সহচর অমরনাথ তাহারই সহকারী—অকৃত্রিম বন্ধু ও ভাবী ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব নারায়ণ!

মাতার নিদেশ পূর্ণ হইলে—পূর্ণ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত হইলে, দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যে দিন ধার্য্য হয়, তাহার দুই-চারিদিন

পূর্ব্ব হইতেই নৃসিংহের সহকর্ম্মী বন্ধুবৃন্দ তাঁহাকে উপর্য্যুপরি বিদায়ভোজ দিতে থাকে। সেই উপলক্ষে কয়দিন অনিয়ম হওয়ায় এবং নিশীথে হিমভোগ করার ফলে, পাতিয়ালা-ত্যাগের পূর্ব্বদিন তাঁহার প্রবল জ্বর ও বিষম সর্দ্দি হয়। তাঁহার রাজ-প্রভু ও শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্রবর্গ সকলেই তজ্জন্য তাঁহাকে আপাততঃ দেশে যাওয়া স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি যে সকল নিষেধ-বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অস্থির—দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসেই রওনা হইলেন। অগত্যা অমরনাথ তাঁহার সহগামী হইল। রুগ্ন অবস্থায় পথের ক্লেশ ও অত্যাচারে পীড়া ভীষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি জীবন সঙ্কট অবস্থায় মাতৃসমীপে—পিতৃ-ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। অভাগিনীর হারানিধি এতদিনে গৃহে ফিরিল। দীর্ঘ-বিয়োগ-বিধুরার পুত্রধন এতদিন পরে জননী-বক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল! অতঃপর কিন্তু সেই বিধান-কুটীল বিধাতার মনে কি আছে—কে জানে!

অদ্ভুত ডাক্তারী

১

"ওহে শুনেছ শিরীষ, রমেশ ব্যাচারার ও যক্ষ্মাই বটে!" একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু জোরের সহিত এই কথাগুলি বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গিতে এরূপ কিছু বোধ হইল না যে তিনি সে জন্য দুঃখিত, বরং রমেশর যক্ষ্মা হওয়াটাই যে স্বাভাবিক এইটাই যেন তাঁহার স্বরে স্পষ্ট বোধ হইল। এঁরা সকলে নৈহাটির ডেলি প্যাসেঞ্জার। ট্রেণের কামরাটি আরোহী পরিপূর্ণ। তবে উক্ত ভদ্রলোক দু'টি এবং আরও তিন চার জনের মধ্যেই এই প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতেছিল। এরা সকলেই এক আফিসে কাজ করেন, প্রত্যহই একসঙ্গে যাতায়াত করেন। রমেশও তাঁহাদের সহযাত্রী এবং সহকর্ম্মী। শিরীষ বলিল "যক্ষ্মাই বুঝি ডাক্তার বল্লে।" ধীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন "ওর কি আর ভুল হয়।"

"হ্যাঁ দেখ দিকি, ব্যাচারার কপালে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ

বেরুল'—সর্দ্দি হয়েছে, বিনা পয়সায় ডাক্তার পেয়েছে—দেখাতে গেল, ডাক্তার বুক একজামিন করে বল্লে—যক্ষ্মা।" হরেনবাবু পান চিবাইতে চিবাইতে কথাগুলি বলিলেন।

"তা' হ'লে বেচারার তো আর নিস্তার নেই। শিবের অসাধ্য রোগ, কি বল হে ধীরেন।" চাদর খানি: পাকাইয়া গলায় বাঁধিতে বাঁধিতে সতীশবাবু উত্তরের অপেক্ষায় ধীরেনবাবুর মুখের প্রতি চাহিলেন। ধীরেনবাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন "তার আর ব'ল্তে! ঐ দেখুন না বাঁড়ুয্যে পাড়ার সুরেশ, মিত্তির পাড়ার নিবারণ, হরি মুখুজ্জের ভাগনে—তাদের তো আর চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি— বাঁচল।"

এইরূপে রমেশ ব্যাচারার অনুপস্থিতিতেই বিজ্ঞ বিচারকের ন্যায় তাঁহারা রায় দিলেন যে রমেশের যক্ষ্মাই হইয়াছে এবং মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য। তর্ক বিতর্কে তাঁহারা এত মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, গাড়ী যখন শিয়ালদহে পৌছিল তখন তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল এবং বোধ হইল গাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে আসিয়াছে। গাড়ী শিয়ালদহে পৌছিলে অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেই যেন তাঁহারা গাড়ী ত্যাগ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে রমেশের সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে কহিতে আফিসাভিমুখে চলিলেন। আফিসে গিয়া স্ব স্ব চেয়ারে চাদরখানি বাঁধিয়া ঐ সম্বন্ধে আফিসের অপর বাবুদিগের নিকট

সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া স্ব স্ব কাজে বসিলেন। কিন্তু কাজে সেদিন বড় কাহারও মন লাগিতেছিল না। এক কলম লেখেন আর রমেশের পরিবারবর্গের কি হইবে—এই পঞ্চাশটি টাকা মাহিনা—ইত্যাদি নানা কথা তাঁহাদের পেটের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল; সুতরাং কলম বন্ধ করিয়া তাঁহারা দু একটি কথা বলেন কিন্তু বড়বাবু বা সাহেবদের পায়ের শব্দ পাইলেই সুবোধ বালকের ন্যায় কাজে মনোযোগ দিতেছেন। নতুন দু'টি ছোকরা এই গোলমালে অনেক ভুল করিয়া বড়বাবুর নিকট ধমকানি খাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিতেছে। বেলা দু'টা বাজে, এমন সময় বিষণ্ণ মুখে—ক্লান্ত হৃদয়ে রমেশ আফিস গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার উপস্থিতে আফিসের বাবুদিগের উপর যেন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইয়া গেল। সকলেই চেয়ার হইতে উঠিয়া উৎসুক নেত্রে তাহার পানে তাকাইলেন।

এই একদিনেই বেচারাকে এমন শীর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে যে, বোধ করি মাস খানেক ধরিয়া জ্বরে ভুগিলেও এরূপ শীর্ণ দেখিতে হয় না। তিন মাসের ছুটি লইবার জন্য একটি আবেদন পত্র হস্তে সে একেবারে বড়বাবুর ডেস্কের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু একটু সহানুভূতি জানাইয়া তাহাকে সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন।

বাবুরা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তাহার পথ পানে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ

ভাবে তাকাইয়া মিনিট গুণিতে লাগিলেন—কতক্ষণে সে আসিবে। শীঘ্রই ছুটির অনুমতি পাইয়া বড়বাবুর সহিত রমেশ ফিরিয়া আসিল। বাবুরা বেচারাকে বেষ্টন করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সপ্তরথীর ব্যূহের মধ্য হইতে অভিমন্যুর বাহির হওয়া যেরূপ দুঃসাধ্য হইয়াছিল, আমাদের রমেশের অবস্থাও সেইরূপই হইয়াছিল বলিতে হইবে। তবে সুখের বিষয় ব্যূহের বাহিরে আসিবার মন্ত্রটা হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল "তা' হ'লে আজ যাই—আবার ডাঃ চক্রবর্ত্তীর কাছে একবার যেতে হ'বে, তাঁকে একবার দেখাব মনে ক'র্‌ছি—এ সব বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।" বলিয়া রমেশ ধীরে ধীরে আফিস-গৃহ ত্যাগ করিল। বাবুরাও ক্ষুণ্ণ মনে আপন আপন স্থানে আসিয়া বসিলেন।

২

বেলা পাঁচটা। ডাঃ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সুসজ্জিত আফিস-গৃহে রোগী বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে মোটর প্রস্তুত। রমেশ একখানি মোটা চাদর মুড়ি দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। ডাক্তারবাবু একটি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া উপদেশ দিতে-ছিলেন। রমেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি চাহিলেন। রমেশ নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া তাঁহার নিকট বসিল। ডাক্তারবাবু তাহার নিকট হইতে আদ্যোপান্ত রোগের ইতিহাসটি শুনিয়া ষ্টেথিস্কোপ বুকে লাগাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন। আঙ্গুল দিয়া টোকা মারিয়া নানা রকম পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। তাহার পর স্পষ্ট বলিলেন "হ্যাঁ 'টিউবার-কিউলেসিস্'ই বটে, আর রোগটা অনেক অগ্রসর হয়ে পড়েছে, দু' দিন আগে এলে—হ্যাঁ, আপনার রক্তটা পরীক্ষা করিয়াছেন কি? আমার বোধ হয় 'টিউবারকিউলেসিস্' ব্যাসিলি ভরা।"

ডাক্তারবাবুর মুখ দেখিয়াই রমেশের প্রাণ উড়িয়া

গিয়াছিল। সে যে কি বলিবে তাহা বুঝিতেই পারিতেছিল না। গলা শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার বোধ হইতেছিল বুঝি সত্যই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু তাহার শীতল হস্তে তাহার গলদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে। অনেক কষ্টে সে বলিল "না, রক্তটা তো পরীক্ষা করান হয় নি।"

"তার দরকারও নাই,—ওতো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।"

শেষের এই কথাগুলি ওরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত জোর করিয়া বলিবার একটু কারণও আছে। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বছর দুই চার কোন এক যক্ষ্মা স্বাস্থ্য-নিবাসে সহকারী চিকিৎসক রূপে কাজ করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য-নিবাসে রোগীকে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করা তাঁহার কাজ ছিল। অবশ্য স্বাস্থ্য-নিবাসে যাঁহারা প্রবেশের জন্য যান তাঁহারা কিছু আর সখ করিয়া যান না—রোগ লইয়াই যান। সুতরাং যক্ষ্মা রোগী পরীক্ষা করিয়া করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, যক্ষ্মা হওয়াটা আজ কালকার লোকের পক্ষে বিচিত্র কিছুই নয়।

ডাক্তারবাবু বলিতে লাগিলেন "দেখুন, আপনার এই অবস্থায় স্ত্রী-পুত্রের নিকট থাকা কত দূর বিপজ্জনক। আমার বোধ হয় কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে যাইয়া দিন কতকের জন্য বাস করা আপনার পক্ষে ও আপনার স্ত্রী-পুত্রের পক্ষে

মঙ্গলকর। চাই কি দিন কতকের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। সেদিন তো আর নাই, বিজ্ঞানের উন্নতিতে ডাক্তারি শাস্ত্রে অসাধ্য সাধন হ'চ্ছে" ইত্যাদি এক লম্বা গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া ডাক্তারবাবু থামিলেন। এবং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনটা লিখিয়া কম্পাউণ্ডারকে সাত দিনের ঔষধ দিতে বলিলেন। পরে রমেশের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "দেখুন আর একটা ওষুধ দেব, দিন তিন চার পরে এসে নিয়ে যাবেন, আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। বেশ জামা জোড়া গায়ে দিয়ে থাক্‌বেন। আর কেমন থাকেন, মাঝে-মাঝে খবর দিয়ে যাবেন।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া রমেশ ডাক্তার-গৃহ ত্যাগ করিল। মনটা প্রথম হইতেই তাহার ভাল ছিল না, তাহার উপর ডাক্তারবাবুর এই 'সাংঘাতিক' বাক্য শ্রবণ করিয়া সে একেবারেই দমিয়া গিয়াছিল। ডাক্তারবাবুর বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া অন্যমনস্কভাবে সে ময়দানের দিকে চলিতেছিল; কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, কিছুই তাহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া দেখিল, রাস্তার দু'ধারের গ্যাসগুলি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে, ঘরে-ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়া হইতেছে। আকাশেও সন্ধ্যা দেবী তারার প্রদীপ জ্বালাইয়া কুলবধূর ন্যায় দয়িতের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। রমেশ

ফরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনাভিমুখী হইল, পথে আসিতে আসিতে নানা দুশ্চিন্তা তাহার মনোমধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগিল। ছোঁয়াছে রোগ—স্ত্রী-পুত্রের নিকট থাকা অনুচিত—অথচ রোগের কথা ঘুণাক্ষরে যদি মন্দা জানিতে পারে, তাহা হইলে ত নিস্তার নাই। তাহার এঁটো পাতেই ইচ্ছা করিয়া খাইবে, কাহারও বারণ শুনিবে না। তাহার উপর এই কয়বৎসরে বেচারা যৎসামান্য যাহা দু' এক হাজার জমাইয়াছে, তাহা মন্দা ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া চিকিৎসায় খরচ করিয়া ফেলিবে। আহা পুত্র অনিলকুমার—সে কি দোষ করিয়াছে! ভগবন্! বাছাকে কে দেখিবে, সে যে পিতা ভিন্ন কাহাকেও জানে না। পিতা আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, সে যে তাঁহার সঙ্গেই খেলা করে—তিনিই যে তাহার সঙ্গী। তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে—চুম্বনে চুম্বনে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। হয়ত সে এখনও জাগিয়া বসিয়া আছে—উপস্থিত হইলেই তাহার পাওনা চুম্বনটি আদায় করিবে। এইরূপ নানা চিন্তায় তাহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। নৈহাটিতে পৌঁছিয়া বাঁড়ুজ্জে পাড়া ছাড়াইয়া গলির মোড় ঘুরিতেই তাহার জানলা হইতে আলোকরশ্মি রাস্তায় পড়িয়াছে, তাহা তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। তবে কি খোকা জাগিয়া আছে? ঐ যে দু'টি অস্পষ্ট ছায়া রাস্তায়

পড়িয়াছে, ও কাহার! হঠাৎ কে যেন তাহার মাথায় বুদ্ধি জোগাইয়া দিল। সে কি বোকা! এটা এতক্ষণ মনে পড়ে নি, তাহার তো পাঁচ হাজার টাকার 'জীবন-বীমা' আছে, তাহার মৃত্যুর পর সেই টাকাটা, আর তাহার এই যৎসামান্য কয়েক বৎসরের সঞ্চয় আর জায়গা-জমি যাহা আছে, বুঝিয়া চলিলে—ইহাতেই নিশ্চয় মন্দা খোকাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে।

আর ডাক্তারবাবু ঠাণ্ডা লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন—অসুখ বাড়িবে—তা—ক্ষতি কি? সে তো মৃত্যুই এখন চায়।

যেমন এই সকল কথা তাহার মনোমধ্যে উপস্থিত হওয়া অমনই তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ঔষধের শিশিটি নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া "আঃ বাঁচলুম" বলিয়া একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

স্বামীকে জান্‌লা হইতে দেখিতে পাইয়া কড়া নাড়িতে না নাড়িতে মন্দা দরজা খুলিয়া দিয়া উৎকণ্ঠাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁগা, এখন কেমন আছ? শরীরটা অসুখ্-অসুখ্ বলে গেলে—আমি তো বাবু, ভেবে সারা—তার উপর এত রাত হ'ল, ঘর আর বার ক'র্‌ছি। এখন ভাল তো?"

"হ্যাঁ, উপরে চল" বলিয়া রমেশ সিঁড়ি বহিয়া উপরের

ঘরে প্রবেশ করিল। খোকা খাটের উপর নানা খেলনা লইয়া খেলা করিতেছিল, পিতাকে দেখিয়া ঝাঁপাইয়া বুকের উপর পড়িয়া "বাবা চুমু—চুমু" বলিয়া অবোধ বালক পিতার মুখের উপর মুখ রাখিতে গেল। রমেশ তাড়াতাড়ি মুখ সরাইয়া লইয়া খোকার পৃষ্ঠে একটি চুম্বন দিয়া বলিলেন "এ একরকম নতুন চুমু—কেমন?" তাহার পর সকলের অলক্ষ্যে জল দিয়া খোকার পৃষ্ঠের সেই স্থানটি মুছাইয়া দিলেন। মন্দা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। রমেশকে চুপ করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "আমারও কি ঐ রকম—"

"হাঁ মন্দা,—অবশ্য কারণ আছে, ডাক্তার বল্লেন, আমার বুকের একটু দোষ হয়েছে—তোমাদেরও হ'তে পারে;—ছোঁয়াচে রোগ।"

"ওমা সে কি কথা! তা হ'লে কি হবে?" মন্দা চক্ষে কাপড় দিল। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিল না, শাশুড়ী পাশের ঘরে রহিয়াছেন। রমেশ যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল দেখিয়া, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "আঃ বুঝছ না মন্দা! ডাক্তার বলেছেন, এমন কিছুই নয়—একটা মাস একটু কষ্ট—খোকাকে চুমু-টুমু খাওয়া হবে না। প্রাণের ভয় কিছুই নেই? ভয় কি?"

মুখে এতগুলি কথা বলিলেও প্রাণের মধ্যে তাহার যে কি

হইতেছিল, আর এত কথা সে এমন গুছাইয়া কি করিয়া বলিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

"খোকাকে না হয়—?"

"ছি, অবুঝ হচ্ছ কেন মন্দা? যাও খাবার বাড়গে।"

মন্দা চলিয়া গেলে রমেশ হাত-মুখ ধুইল। মাতা একটু কাণে কম শোনেন, খোকার চীৎকার শুনিয়া এতক্ষণে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এত দেরী হ'ল কেন বাবা?"

"এই কাজের ঝঞ্ঝাটে দেরী হয়ে গেল মা" বলিয়া স্নেহান্ধ জননীকে রমেশ ভুলাইল। কিন্তু পারিল না একরত্তি মেয়ে মন্দাকে। এইখানেই পুরুষের দুর্ব্বলতা।

৩

আহার শেষ করিয়া রমেশ পুনরায় ঘরে ঢুকিল। মন্দা খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। রমেশ ঘরে ঢুকিতে কাঁথাখানা খোকার গায়ে দিয়া নিজের গায়ের কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

রমেশ মন্দার প্রতি চাহিয়া বলিল "যাও খাওগে, খোকা ঘুমিয়েছে? রাত অনেক হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ যাই; পান নাও" বলিয়া মন্দা পানের ডিবাটি টেবিলের উপর রাখিল। মন্দাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া

রমেশ বলিল "দাঁড়িয়ে রইলে কেন মন্দা, যাও খাওগে, ভয় কি! তোমার জিনিস কি অন্যে নিতে পারে, স্বয়ং ধর্ম্মরাজও নয়। তুমি যে আমাকে অক্ষয়-কবচ দিয়ে ঘিরে রেখেছ মন্দা" বলিয়া রমেশ পত্নীর মনোভাব বুঝিয়া তাহার হাতখানি নিজ হস্তমধ্যে চাপিয়া ধরিল। মন্দার বুক আনন্দে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। এমন স্বামী তাহার, সে ধীরে-ধীরে রান্নাঘরের দিকে চলিল।

রান্না-বান্না সমস্তই সে করিয়া গিয়াছিল, কেবল দুধটা জ্বাল দিয়া হেঁসেল তুলিতে বাকি। রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল, শাশুড়ী দুধ জ্বাল দিতেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট গিয়া সে বলিয়া উঠিল "ওঠ না মা, আমি দুধটা জ্বাল দিয়ে নিচ্ছি।"

"বাঃরে পাগলি মা খেতে বস। সারাদিনই তো খাটছিস্, কিছুই তো ক'র্‌তে দিস্ না। ভাল মানুষের মেয়ে তো কথা শুনবে না। এমন অদৃষ্ট আমার দুটো ভাল মন্দ খেতে দিতেও পারি না।"

সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তার কথা মনে হওয়ায় গৃহিণী চক্ষে কাপড় দিলেন। মন্দা চুপ করিয়া হাঁড়ি-হেঁসেল তুলিয়া নিজের ভাত বাড়িয়া অবশিষ্ট অন্নে জল ঢালিয়া রাখিল। ইত্যবসরে গৃহিণী চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মাছ-টাচ নিয়েছ তো, যা' তোমার ভুল,—কই দেখি? পাগলির নিজের জন্যে কিছু আর রাখ্‌তে মনে থাকে না—ঐ এক টুক্‌রো মাছ!"

"না মা, আর এক টুক্‌রো যে খাচ্ছি" বলিয়া মন্দা স্নেহময়ী শাশুড়ীর কথা চাপা দিল। গৃহিনীও দুধ নাড়িতে লাগিলেন। শাশুড়ী-বধূতে আর বড় একটা কথা হইল না। মন্দা আহার শেষ করিয়া ঘর ধুইয়া ফেলিল, পরে কাপড় কাচিয়া শাশুড়ীর জলখাবার গোছাইল। গৃহিনীও ইতোমধ্যে কল্যকার বাঁধিবার সব যোগাড় করিয়া রাখিলেন, পরে শাশুড়ীর আহার শেষ হইলে দু'জনে শয়ন করিতে গেলেন। মন্দা ঘরে ঢুকিয়া দেখে, রমেশ তখনও চেয়ারে বসিয়া এমন একমনে কি একখানা বই পড়িতেছে যে মন্দার ঘরে ঢোকাতেও তাহার কোন ব্যাঘাত হইল না, সে দিব্য পড়িয়া যাইতে লাগিল। এই অবজ্ঞা সে সহ্য করিতে পারিল না। ঘাড়ে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি পড়া হচ্ছে? এখনও শোও নি?"

"ও মন্দা! তুমি শুয়ে পড়, আমি বইটা শেষ না করে শুতে পার্‌ব না। ললিতার কি হ'ল, এটা না জান্‌তে পার্‌লে সুস্থির হ'য়ে ঘুমুতে পার্‌ব না। আর ভয় কি তোমার, আমি তো এই পাশের ঘরে খাটে শোব, মাঝ-খানের দোর খোলা রইল। তুমি ঘুমোও।"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রমেশ পড়িল। বইখানি শেষ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। শীত-

কালের রাত্রি। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস জান্‌লার ফাঁক দিয়া মাঝে-মাঝে ঢুকিয়া হি হি করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছে। রমেশ একবার উঠিয়া গিয়া মন্দা ও খোকাকে দেখিয়া আসিল। গায়ে লেপখানি ভাল করিয়া দিয়া দিল। পরে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি চারটে কি পাঁচটা হবে, ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়মড় করিয়া রমেশ বিছানায় উঠিয়া বসিল। মন্দা তখনও নিঃশব্দে ঘুমাইতেছে; ধীরে-ধীরে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া কক্ষের পর কক্ষ পার হইয়া একেবারে খিড়কীর দরজায় উপস্থিত হইল। শীতের প্রভাতে, শিশিরসিক্ত দূর্ব্বায় রমেশের খালি পাদু'খানি বেশ একটু সিক্ত হইয়া গেল। মাঝে-মাঝে শিউলির মিষ্ট গন্ধে তাহাকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছিল। মায়ার বন্ধনে আবার বুঝি বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছিল। একটা ঘন কুয়াসায় সারা জগৎটাকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। রমেশের মনে মাঝে-মাঝে ভয়ের ভাবটাও যে হইতেছিল না এ কথা জোর করিয়া বলা শক্ত। অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিঃপ্রকৃতির এমন সুন্দর মিল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুকুর-ধারে আসিয়া ঠাণ্ডা কন্‌কনে বরফের মত জলে নামিতে রমেশের মন মোটেই সরিতেছিল না।

আবার জলে না নামিলেও নয়, সুতরাং কাপড় জামা পুকুর-পাড়ে রাখিয়া দুর্গা বলিয়া সে জলে নামিয়া পড়িল। পরে যখন শীতটা কাটিয়া গেল, তখন বেশ করিয়া সাঁতার কাটিয়া সে যখন তীরে উঠিল, তখন তাহার মুখের উপর হইতে দুশ্চিন্তার ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে; বরং বেশ একটা প্রফুল্লতার ভাব তাহার মুখে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভোরের পাখী ডাকিবার পূর্ব্বেই রমেশ ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। প্রত্যূষে যখন পাখীরা প্রভাতী তান ধরিয়াছে, এমন সময় মন্দা তাড়াতাড়ি উঠিয়া রমেশের গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া গেল। রমেশ তখন আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—মুখে চোখে বেশ প্রশান্ত ভাব। নিশ্চিন্তমনে মন্দা ঘরের কাজ সারিতে লাগিল। ইত্যবসরে রমেশ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া একটু বেড়াইয়া আসিল। দু'পাঁচ দিনেই যেন তাহার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। প্রত্যহই ভোরে পুকুরে স্নান, বেড়ান—এইরূপ নিয়মে দিন সাতেক চলার পর ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর নিকট যাইবার কথা রমেশের মনে পড়িল। মোটা একখানা চাদর মুড়ি দিয়া সকালের ট্রেণেই সে কলিকাতায় রওনা হইল। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর গৃহ তখন রোগী-

পরিপূর্ণ। রমেশ ঢুকিতেই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন "কেমন আছেন? দেখে তো ভাল বলেই বোধ হচ্ছে। তারপর—ওষুধ বুঝি ফুরিয়েছে? বসুন—বসুন।" রমেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে বুকটা আর একবার—"

"হাঁ—হাঁ—এই যে" বলিয়া ডাক্তারবাবু ষ্টেথিস্কোপটি বুকে লাগাইয়া পরীক্ষা করিলেন। "তাই তো" বলিয়া আবার বুকে নলটি লাগাইলেন, পরে হাস্যমুখে পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "দেখেছ—একেবারে সেরে গেছে। তোমার অসুখ যে হয়েছিল, তার আর চিহ্ন নেই। মুখ চোখের ভাব দেখেই আমি ঠাউরেছিলুম—এখন বিজ্ঞানের রাজত্ব, ঠিক্ অষুধটি পড়লে কি আর রক্ষে আছে। এখন আরও দিনকতক সাবধানে থেক—ভয় নেই, সেরে যাবে।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া রমেশ হাসিতে হাসিতে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মনে মনে বলিতে লাগিল "বাবা, ভয়েই আমায় আধমরা করে দিয়েছিলে—আর রক্ষে ছিল—রোগ না থাকলেও দু'দিনেই এসে যুট্‌ত,—ভাগ্যিস মরিয়া হয়ে রোগের চিন্তা ছেড়ে আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলুম—নইলে—?"

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

মফস্বল বাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৵৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিতগুলি একত্রে লইতে হয় বা পত্র লিখিয়া সুবিধানুযায়ী পৃথক্ পৃথক লইতে পারেন।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **অভাগী** (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। **পল্লীসমাজ** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৫। **বিবাহবিপ্লব** (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

৬। **চিত্রালী**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। **দূর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

৮। **শাশ্বত ভিখারী** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

৯। **বড় বাড়ী** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

১০। **অরক্ষণীয়া** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। মকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। ক্যাল্‌দোর বাড়ী—শ্রীসুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। সুখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা